ইউনিট - ৯

কতিপয় বিশিষ্ট দার্শনিক ঃ ইবনে সিনা

Ronowned Philosopher : Ibn Sina

ভূমিকা

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে ইবনে সিনা অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে ইনসাইক্লোপেডিস্ট, দার্শনিক, চিকিৎসক, দেহতত্ত্ববিদ, অংকশাস্ত্রবিশারদ, জ্যোতির্বিদ এবং কবি ছিলেন। অনেকের মতে তিনি ছিলেন ইসলাম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এবং সর্বজাতি, সর্বস্থান ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অন্যতম। মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে তাঁর দর্শনের গুরুত্ব সর্বোচ্চ। এজন্য আরববাসীগণ তাঁকে 'আল-শেখ আল-রাইস' বলে আখ্যায়িত করেন। এ মহান দার্শনিকের পূর্ণ দর্শন আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয় বলে তাঁর দর্শনের কিছু মূল বিষয় এ ইউনিটে আলোচনা করা হল। এর সাথে যতদূর সম্ভব হবে আমরা চেষ্টা করব– তাঁর দর্শনে তাঁর নিজস্ব অসাধারণ অবদান ও পদ্ধতি কোথায় সংকলিত তা খতিয়ে দেখা। এই ইউনিটে মোট চারটি পাঠ রয়েছে।

পাঠ-১ : ইবনে সিনার জীবনী ও গ্রন্থাবলী (Life and Books of Ibn Sina)

পাঠ-২ : ইবনে সিনার যুক্তিবিদ্যা (Logic of Ibn Sina)

পাঠ-৩ : ইবনে সিনার অধিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব (Metaphysics and Natural Religion of Ibn Sina)

পাঠ-৪ : আত্মা, মন ও জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ে ইবনে সিনার ধারণা (Ibn Sina's Concept of Soul, Mind and Knowledge)

পাঠ-১

ইবনে সিনার জীবনী ও গ্রন্থাবলী
Life and Books of Ibn Sina

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ইবনে সিনার জীবনী সম্পর্কে পরিচয় পারবেন।
- তাঁর গ্রন্থাবলী সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- সংক্ষেপে তাঁর আলোচিত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ভূমিকা

মধ্যযুগীয় দর্শন চিন্তার ইতিহাসে ইবনে সিনা একজন অসাধারণ চিন্তাবিদ। মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি যেমন কালজয়ী একজন দার্শনিক, তেমনি তাঁর জীবন প্রবাহও বৈচিত্র্যে ভরা। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের উত্থান ও পতন তাঁর কর্মশক্তি বিনষ্ট করতে পারেনি। বরং উত্থানের সময় যেমন তিনি চিন্তাধারার বিকাশের কাজে লিপ্ত থাকতেন, তাঁর জীবনের সংকটময় মুহূর্তেও তিনি তেমনিভাবে গ্রন্থ রচনায় কালক্ষেপণ করতেন। তাঁর ঘটনাবহুল জীবন দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। কিন্তু তিনি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জীবনকালে যে অবদান রেখেছেন তা আজও অমূল্য সম্পদ। আমরা এই পাঠে এ দার্শনিকের ঘটনাবহুল জীবনের সঙ্গে পরিচিত হব এবং তিনি যেসব কালজয়ী গ্রন্থাবলী রেখে গেছেন সেসব গ্রন্থের মধ্যে কিছু গ্রন্থের পরিচয় এই পাঠে পাব। ইবনে সিনার চিন্তাধারায় হেলেনীয় ভাবধারার প্রভাব ছিল বটে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দর্শন চিন্তায় যে পদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করেন তা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। তাঁর জীবনী ও গ্রন্থাবলীর আলোচনার ফাঁকে আমরা তাঁর এ অভিনব পদ্ধতির দিকেও যতটুকু সম্ভব লক্ষ্য রাখব।

ইবনে সিনার জীবনী

ইবনে সিনার জীবনী সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করে তাঁর জীবন ও কর্মের বিবরণ দেওয়া হল।

আবু আলী আল-হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে সিনা পাশ্চাত্য জগতে 'আভিসেনা' নামে পরিচিত। আভিসেনা ল্যাটিন নাম। হিব্রু ভাষায় তাঁকে 'আভেন সিনা' নামে ডাকা হয়। অধুনা ইউরোপে তিনি ইবনে সিনা নামে পরিচিত হন। তিনি বুখারার নিকটবর্তী বিশাল গ্রাম কারমাইথান (সূর্য্যের স্থান) গ্রামে সফর ৩৭০ হি:/ আগস্ট ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বলখের (গ্রীক ভাষায় 'ব্যাকট্রা') অধিবাসী ছিলেন। ইবনে সিনার জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ তাঁর নিজ জন্মভূমি বলখ ত্যাগ করে বুখারায় আসেন। এ সময়ে বুখারা রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার এক বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। ইবনে সিনার পিতা মনসুরের পুত্র দ্বিতীয় নুহ কর্তৃক কারমাথাইনের গভর্ণর নিযুক্ত হন। এ ধরনের নিয়োগ থেকে বুঝা যায় সিনার পিতা একজন মর্যাদাসম্পন্ন লোক ছিলেন। আবদুল্লাহ এখানে বিবাহ করেন এবং দু'পুত্র লাভ করেন। ইবনে সিনা দু'ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

ইবনে সিনার বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর পিতা বুখারায় গমন করেন। ইবনে সিনার বাল্যশিক্ষা এখানে শুরু হয়। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি পুরো কোরান মুখস্ত করেন। এর সাথে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিদ্যা রপ্ত করায় তিনি তখনই খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর তিনি ফিক্হ শাস্ত্র এবং কালাম অধ্যয়ন করেন। এর পাশাপাশি তিনি সাহিত্যেও শিক্ষালাভ করেন। এ সময় ইসমাঈলীদের বিদ্যা চর্চায় খ্যাতি ছিল। বুখারায় তাঁর পিতার মাধ্যমে তিনি এদের সংস্পর্শে আসেন। জানা যায়,

ইসমাঈলীদের সংস্পর্শে আসায় বিভিন্ন বিদ্যার প্রতি তাঁর অনুরাগ সৃষ্টি হয়। এ সময়ে তিনি নিজে মুসলিম ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করছিলেন। ঘটনাচক্রে এই সময়ই নাতেলী নামক একজন চিন্তাবিদ বুখারায় আগমন করলে সিনার পিতা তাঁকে নাতেলীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নিয়ে যান। তিনি নাতেলীর নিকট ন্যায়-দর্শন, জ্যামিতি, জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞানের শিক্ষালাভ করেন। নাতেলী পরফাইরীর 'ইসাগোগ' দিয়ে ছাত্রের শিক্ষা শুরু করেন। ইবনে সিনা নাতেলীর 'জাতি' সম্পর্কেও সংজ্ঞাদানের সময় নিজে এ সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা দেন যে নাতেলী তাঁর পিতাকে বলেন ইবনে সিনাকে যেন শিক্ষা ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত না করা হয়। ইবনে সিনা এ সময়ে যুক্তিবিদ্যার কিছু অংশ শিক্ষকের কাছে শিখেন এবং বাকী অংশ মন্তব্যসহ নিজে আয়ত্ত করেন। তিনি এমন প্রতিভাবান ছিলেন যে, শিক্ষক তাঁকে যে শিক্ষা দিতেন– তিনি নিজে তাঁর চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকতেন। এভাবে নাতেলীর কাছে দ্রুত তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতি, টলেমির আলসাগেস্ট প্রভৃতি শিক্ষা গ্রহণ করেন। নাতেলীর গুরুগৃহ ত্যাগ করার পর ইবনে সিনা নিজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের দর্শনচর্চাও শুরু হয় এ সময়ে।

এরপর ইবনে সিনা চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং এ বিষয়ের ওপর প্রাপ্ত সমস্ত গ্রন্থ পড়ে ফেলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থকে কঠিন মনে করতেন না বলে অল্পদিনের মধ্যেই এ শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তিনি ধর্মীয় আইন ও বিতর্কের বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন প্রায় একই সঙ্গে। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করার পর চিকিৎসাকার্যে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে লব্ধ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধন করেন। তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞানের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, 'যখন চিকিৎসা শাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না, তখন হিপোক্রিটাস এর জন্ম দেন। যখন এ শাস্ত্র মৃত প্রায়, তখন গ্যালেন এ শাস্ত্রকে পুনর্জীবিত করেন। আর যখন এ শাস্ত্র বিক্ষিপ্ত ও গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন আল-রাজী একে সুসংবদ্ধ করেন। আর এ শাস্ত্র যখন অসম্পূর্ণ ছিল তখন ইবনে সিনা এ শাস্ত্রকে সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা দান করেন।'

ইবনে সিনা অধ্যয়নে এমন নিমগ্ন থাকতেন যে, তাঁর নিজস্ব বর্ণনা অনুসারে তিনি এক সময় একনাগাড়ে আঠার মাস ঘুমাননি। এ সময় তিনি যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শনের বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করছিলেন। তিনি দিবারাত্র অধ্যয়ন করতেন ও লিখতেন এবং লিখিত বিষয়গুলো ফাইলবন্দী করে রাখতেন। যখন কোন বিষয় বুঝতে তাঁর অসুবিধা হত, তখন তিনি মসজিদে যেতেন এবং প্রার্থনারত থাকতেন। তিনি বলেন প্রার্থনারত অবস্থায় তিনি সমস্যার সমাধান লাভ করতেন। সন্ধ্যায় বাতি নিয়ে বসে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতেন। ঘুম আসলে বা দুর্বলতা বোধ করলে এক গ□াস সুরা পান করতেন এবং আবার কাজে মনোনিবেশ করতেন।

এভাবে দিবারাত্র অধ্যয়ন করে তিনি যুক্তিবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও অংকশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এ সময়ে এ্যারিস্টটলের মেটাফিজিক্স গ্রন্থটি তিনি চল্লিশবার অধ্যয়ন করেও বুঝতে সক্ষম হননি। অকস্মাৎ রাস্তার বই বিক্রেতা তাঁকে সস্তা দামে একটি বই কেনার অনুরোধ করলে তিনি অনিচ্ছা সহকারে তা ক্রয় করেন। এ বইটি মেটাফিজিক্স' গ্রন্থের ওপর আল-ফারাবীর আলোচনা সংক্রান্ত গ্রন্থ। তিনি দ্রুত গৃহে ফিরে এসে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেন এবং এ্যারিস্টটলের দর্শন বুঝতে সক্ষম হন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পরবর্তী দিন তিনি দরিদ্রদেরকে অর্থ দান করেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিজদা করেন।

ইবনে সিনার জীবনের মোড় এ সময়ে ঘুরতে শুরু করে। তাঁর বয়স এ সময় ১৮ বছর। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের কথা ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক এ সময় একদিন বুখারার শাসনকর্তা নূহ ইবনে মনসুর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিৎসক রোগ আরোগ্যে ব্যর্থ হয়ে ইবনে সিনার শরণাপন্ন হন। ইবনে সিনার চিকিৎসায় মনসুর আরোগ্য লাভ করেন। শাসনকর্তা মনসুর খুশি হয়ে তাঁকে সামানিদ শাসনকর্তাদের লাইব্রেরী ব্যবহার করার অনুমতি দেন। এই গ্রন্থাগারে অনেক ধরনের গ্রন্থের মধ্যে তিনি গ্রীক দর্শন সংক্রান্ত বহু গ্রন্থের সন্ধান পান এবং সেগুলো অধ্যয়ন করে নিজস্ব মন্তব্য লিখেন। ইবনে সিনা তাঁর

অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও বোধশক্তির সাহায্যে এখানে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। তিনি এ সম্পর্কে বলেন, "I read these books talking notes of their contents. My memory for learning was at that period better than it is now. But to-day I am more mature, otherwise my knowledge is exactly the same and nothing new came my way after that"

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইবনে সিনার জীবন ছিল ঘটনাবহুল। তাঁর কর্ম জীবনের ঘটনা এখান থেকেই শুরু। তাঁর বয়স যখন বিশ বছর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হলে জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি গুরগঞ্জে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বুখারা ছেড়ে কেন সেখানে যান– তা জানা যায়নি। যাহোক এ সময়ে বুখারার শাসনকর্তার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর ফলে সেখানে রাজনৈতিক গোলযোগ শুরু হলে ইবনে সিনা বুখারা ত্যাগ করেন। জানা যায়, তিনি ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে খাওয়ারিজমে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছার পূর্বে তিনি কাঁসা, বাওয়াদ, তুস, সাক্কান, সাসনিকান, জাসারম এবং সর্বশেষে সুলতান কাবুসের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য জুরমান পৌঁছেন। খাওয়ারিজমে তিনি আলী ইবনে মামুনের দরবারে আল-বিরুনী, আবু নসর আল-ইরাকী, আল-খামমার এবং আবু সায়্যিদ আল খায়ের প্রমুখ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সুফীর সঙ্গে পরিচিত হন। কথিত আছে– এ সময়ে গযনীর সুলতান মাহমুদ ইবনে সিনা, আল-খামমার, আল আররাক এবং আল-বিরুনীকে তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার জন্য বিশেষ দূত প্রেরণ করেন। গযনীর সুলতান মাহমুদের বদান্যতার কথা শুনে খামমার, আররাক এবং বেরুনী গযনী রওয়ানা হন। কিন্তু ইবনে সিনা তথায় না গিয়ে গোপনে গুরগঞ্জ থেকে পলায়ন করেন। সুলতান একথা শুনে খুব রাগান্বিত হয়ে পেন্টার আররাককে দিয়ে ইবনে সিনার ছবি আঁকিয়ে তা বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেন এবং তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। এরপর তিনি এবং মন্ত্রী মাসিহী বিভিন্ন জায়গা ঘুরে তুসে পৌঁছেন। কিন্তু মাসিহি মরুভূমির উত্তপ্ত রোদের জ্বালায় ইন্তেকাল করেন। ইবনে সিনা এরপর রায়ে গমন করে রাজ অনুগ্রহ লাভ করেন।

রায় থেকে তিনি হামাদানে গমন করেন। এখানে তাঁর প্রভূত খ্যাতির কথা কারও অজানা ছিল না। এসময় এখানে একজন প্রভাবশালী মহিলা শাসনকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। ইবনে সিনা এখানে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী হিসেবে কাজ করার সময় সেখানকার সৈন্যবাহিনীর রোষানলে পড়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়ারও দাবি ওঠে। তিনি আবার আত্মগোপন করেন। শাম্‌স উদ-দৌলা কালিক রোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে আবার খুঁজে বের করা হয়। আমীর তাঁর সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে তাঁর প্রতি কৃত আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইবনে সিনাকে পুনরায় মন্ত্রী নিয়োগ করেন। শামস-উদ-দৌলার মৃত্যুর পর সৈন্যবাহিনী তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আত্মগোপন করেন। এ সময় তিনি যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন।

কিন্তু তাঁর জীবনে কোথাও নিরবচ্ছিন্ন অবস্থান করা সম্ভব ছিল না বলে তাঁকে আবার দেশ থেকে দেশান্তরে ফিরতে হয়। জানা যায়, তিনি অবশেষে ইস্পাহানের আমীর আলা-উদ-দাওলার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এই আমীর স্বাধীন চিন্তা ও মতবাদের পোষক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে ইস্পাহানের পতন হলে আমীর আলা-উদ-দৌলা পলায়ন করেন। তাঁর সাথে ইবনে সিনাও ছিলেন। পলায়নকালে তিনি কালিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁকে ফেলে তাঁর সঙ্গী আমির চলে যেতে পারেন- এ চিন্তায় তিনি খুব সাহসী ভূমিকা নিয়ে নিজের চিকিৎসা নিজেই করেন। তিনি তাঁর জ্ঞান অনুসারে ইনজেকশন দিতে থাকেন। অতিরিক্ত ইনজেকশন প্রয়োগের ফলে তাঁর মূত্রাশয় আলসারগ্রস্থ হয়। তারপরও তিনি হাল ছাড়েননি। তিনি মনোবল বজায় রেখে নিজের চিকিৎসা নিজে চালিয়ে যান এবং শেষপর্যন্ত আবার ইস্পাহানে পৌঁছেন। এ সময় তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ সুস্থ হয়ে ওঠে আবার রাজদরবারে যাতায়াত শুরু করেন। এ সময় আলা-উল-দৌলা পুনরায় হামাদান রওয়ানা হলে তিনিও তাঁর সঙ্গী হন। পথে তিনি পুনরায় অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অনুভব করেন যে, এবার তাঁর পরপারে যাত্রার পালা। তিনি সর্বপ্রকার চিকিৎসা পরিহার করেন এবং বলেন, The manager who used to manage me, is incapable of managing me any

longer, so there is no use trying to cure my illness. ইবনে সিনা এ অবস্থায় আর বেশিদিন বাঁচেননি। ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে (হিজরী ৪২৮ সনে) জুলাই মাসে হামাদানে তিনি ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তাঁর কবর হামাদানে এখনও বিদ্যমান।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইবনে সিনা কি একজন আরবীয় ছিলেন নাকি পারসিয়ান? তাঁর পিতার বংশানুক্রমিক পরিচয় সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে কেউ তাঁকে আরবীয় বলে দাবি করেন। আবার তাঁর মত মহান দার্শনিককে তুর্কি বংশোদ্ভূত বলে দাবি করতেও অনেকে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁকে পারসীয় বলে দাবি করারও জোর কম ছিল না। এখন তাঁকে কি বলে চিহ্নিত করা যায়? আসলে তিনি আরব দেশীয় ছিলেন না। কারণ জানা যায় যে তাঁর জীবনের প্রথমদিকে তিনি আরবী ভাষা তেমন জানতেন না। আরবী ভাষায় তাঁর জ্ঞান নিয়ে বিদ্রূপ করলে তিনি এমনভাবে আরবী ভাষা আয়ত্ত করে ভাষাতত্ত্বের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন যে, খোদ আরবী ভাষাভাষী পণ্ডিতদের পক্ষেও তা বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি একজন তুর্কিও নন কারণ, তাঁর জীবনকালে সব সময় দেখা গেছে– তিনি তুর্কি পৃষ্ঠপোষকতা সর্বদাই পরিহার করেছেন এবং পারসিয়ান পৃষ্ঠপোষকতা অন্বেষণ করেছেন। তাঁর মাতা ছিলেন একজন পারসিয়ান নাম আফ সানেহ। এ থেকে বুঝা যায় পারসিয়ানদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ। সেজন্য গবেষকরা তাঁকে পারসিয়ান বলেই অভিহিত করেন এবং এর পক্ষেই যুক্তির পাল্লা ভারী।

ইবনে সিনার গ্রন্থাবলী

ইবনে সিনার জীবনী আলোচনার সময় তাঁর প্রতিভার পরিচয় ইতোপূর্বে পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে। যতদূর জানা যায়, ইবনে সিনা তাঁর অস্থির ও ঘটনাবহুল জীবনে প্রায় দু'শত গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে সংশয়মুক্ত গ্রন্থের সংখ্যা একশতটি। সৌভাগ্যক্রমে এসব গ্রন্থের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো পাওয়া গেছে। দু:খজনক ব্যাপার হল ইস্পাহানে যখন তাঁর গ্রন্থাগারটি পুড়িয়ে দেওয়া হয় তখন পরিণত বয়সে লেখা তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ কিতাব আল-ইনসাফ গ্রন্থটি পুড়ে যায়। তবে এর কিছু অংশ যে কোনভাবে অক্ষত থাকে।

ইবনে সিনার গ্রন্থাবলীর কথা বলতে গিয়ে অবশ্যই তাঁর শিষ্য এবং ভক্তদের কথা উল্লেখ করতে হয়। কারণ তারাই তাঁর গ্রন্থের ক্রম এবং পারম্পর্য (sequence) রক্ষা করেন। তিনি যেসব গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁর অধিকাংশই আরবী ভাষায় লেখা। তিনি কিছু গ্রন্থ ফারসি ভাষায় লিখেন। ভাষার প্রতি তাঁর তেমন লক্ষ্য না থাকলেও দার্শনিক ধারা এবং শব্দাবলী পরবর্তীকালের দর্শনের উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করে। ইবনে সিনার আরবী ভাষা আল-কিন্দি এবং আল-ফারাবীর চেয়ে অনেক প্রাঞ্জল ছিল। তাঁর গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দাবলী, abstract শব্দের সমাহার এবং এগুলো আরবীয়দের পছন্দসই ছিল না। এসব শব্দাবলী গ্রীক বা সিরিয়াক শব্দ নয়, বরং এগুলো ফারসি ভাষায় তাঁর জ্ঞান থেকে নেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এ কারণে পারস্যবাসীরা এসব শব্দকে প্রাকৃতিক ও সন্তোষজনক মনে করলেও আরববাসীদের মতে এগুলো কর্কশ শব্দ ছিল।

ইবনে সিনার গ্রন্থাবলীর মধ্যে আরেকটি বিশেষত্ব হল যে তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে বিভিন্ন বিভাগে এবং উপ-বিভাগে বিভক্ত করে প্রকাশ করেন। তিনি যে কোন গ্রীক দার্শনিকের চেয়ে বেশি ভাগ এবং উপ-ভাগের সূচনা করেন। এক সময় পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় এ ধরনের ক্লাসিফিকেশন বা বিভক্তিকরণকে device বা পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ইবনে সিনার গ্রন্থে এ ধরন আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইবনে সিনার আরেকটি কৃতিত্ব হল আরবী ভাষার যথার্থ এবং শুদ্ধ ব্যবহার। তিনি আরবী শব্দের সংজ্ঞা ও বিশেষীকরণ প্রদান করে আরবী ভাষায় যে গ্রন্থটি লিখেন তা এককথায় অনবদ্য। ইবনে সিনাকে ফারসি ভাষায় দর্শন চর্চার প্রকৃত উদ্ভাবক বলা যায়– কারণ তিনি দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় তাঁর দানিশ নামেহ গ্রন্থে যে ফারসি ভাষা ব্যবহার করেন– তা প্রায় ইসলামপূর্ব যুগের ফারসি ভাষা। এতে আরবী শব্দের খুবই উপযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

ইবনে সিনা আরবী ভাষায় কবিতা রচনা করেন। এসব কবিতা চিন্তাধারা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে চিত্তাকর্ষক। তিনি যুক্তিবিদ্যার ওপর কবিতা লিখেন। চিকিৎসার ওপরও তাঁর কিছু কবিতা আছে। কারও কারও মতে, উমর খৈয়ামের কিছু কবিতা আসলে ইবনে সিনার রচিত।

ইবনে সিনার গ্রন্থাবলীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনার পর এবার আমরা তাঁর গ্রন্থাবলীর নাম উল্লেখ করব। তবে তাঁর সমুদয় গ্রন্থের উল্লেখ এখানে অতি দীর্ঘ হবে বলে নিয়ে কেবলমাত্র তাঁর বিখ্যাত কিছু গ্রন্থের উল্লেখ করা হল:

(১) কিতাব আশ-শিফা ঃ এ গ্রন্থটি তিনি অল্প বয়সে রচনা করেন। কিন্তু এটি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে দর্শন, যুক্তিবিদ্যা এবং অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন।

(২) আন-নাজাত ঃ এটি একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ এবং এর এক অংশ আশ-শিফা থেকে সংকলিত।

(৩) আল-ইশারাত ওয়াত তানবিহাত ঃ এটি তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়।

(৪) আল-কামুন ফিত তিব্ব বা সংক্ষেপে আল-কানুন ঃ চিকিৎসা সংক্রান্ত এটি একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আকারে বৃহৎ এবং অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থ। জানা যায়, সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপনা এবং চর্চা এই কানুনের ওপর ভিত্তি করেই হতো। এ গ্রন্থে মনোবিশ্লেষণ থেকে শুরু করে প্রায় সর্বপ্রকার রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইউরোপে এ গ্রন্থ Cannon Medicina নামে খ্যাত।

(৫) আল-আদরিয়াতুল কালবিয়া ঃ এই গ্রন্থটি তুর্কি ভাষায় অনূদিত হয়। উপরোক্ত গ্রন্থগুলো ছাড়াও তাঁর রচিত এবং বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল:

(৬) মাজমু (কমপেনডিয়াম);

(৭) বাদ-দীন (অশুভ ধর্ম সম্পর্কে);

(৮) আল-মুখতাসার আল-আসওয়াত (মধ্যবর্তী সারসংক্ষেপ)

(৯) আল-হাসিল ওয়া আল-মাহসুল (দ্রব্য সম্পর্কিত গ্রন্থ);

(১০) আল-বিরওয়া আল-ইসম (শুভ কর্ম এবং মন্দ সম্পর্কিত গ্রন্থ);

(১১) আল-মাদা ওয়াল মা'বাদ (প্রারম্ভ এবং প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে);

(১২) আল-আরসাদ আল-কুল্লিয়া (সাধারণ পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত গ্রন্থ);

(১৩) মুখতাসার আল-মাজুসতি (আলমাগেস্টের সার সংক্ষেপ);

(১৪) কিতাব আল মা'বাদ (প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত গ্রন্থ);

(১৫) কিতাব আল-হিদায়াহ (হেদায়েত সম্পর্কিত গ্রন্থ);

(১৬) রিসালাত হাই ইবনে ইয়াকজান;

(১৭) কিতাব আল-কুলানজ;

(১৮) আল-আদাবিয়াত আল-কালবিয়া (কার্ডিয়াক-রেমেডি সম্পর্কে);

(১৯) কিতাব আল-নাজাত (মুক্তি সংক্রান্ত গ্রন্থ);

(২০) লিসান আল-আরাব (আরবদের ভাষা সম্পর্কিত);

(২১) মুখতালার আল-আসগার (স্মলার এপিটম সম্পর্কে);

(২২) কিতাব আল-ইনসাফ (বিচার সম্পর্কীয় গ্রন্থ);

তাঁর রচিত দু'শত গ্রন্থের মধ্যে উপরোক্ত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। এসব গ্রন্থের আলোচনায় তাঁর ব্যাপক দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তি এবং শিল্প ও বিজ্ঞানে তাঁর দক্ষতা এত গভীর ছিল যে, বলা যায় পরবর্তী কয়েক শতাব্দীব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা তাঁরই নির্দেশিত পথে প্রবাহিত হয়।

অনুশীলনী

১। ইবনে সিনার শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২। সংক্ষেপে ইবনে সিনার জীবনী আলোচনা করুন এবং তাঁর গ্রন্থ তালিকা থেকে দশটি গ্রন্থের নাম লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য/মিথ্যা

১। ইবনে সিনার পূর্ণনাম ছিল আবু আলী ইবনে সিনা। সত্য/মিথ্যা

২। তিনি কেবলমাত্র একজন বড় দার্শনিক ছিলেন। সত্য/মিথ্যা

৩। আল-কানুন তাঁর রচিত গ্রন্থ। সত্য/মিথ্যা

৪। তাঁর জন্ম হয় কারমাথাইন নামক গ্রামে। সত্য/মিথ্যা

৫। তাঁর মৃত্যু হয় ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে। সত্য/মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ইবনে সিনার ল্যাটিন নাম
(ক) আভিসেনা (খ) অ্যাভেরোজ
(গ) আলেকজান্ডার (ঘ) আভেন সিনা।

২। ইবনে সিনা হামাদান রাজ্যের
(ক) দার্শনিক ছিলেন (খ) চিকিৎসক ছিলেন
(গ) মন্ত্রী ছিলেন (ঘ) কোনটিই নয়।

৩। নাতেলী ছিলেন ইবনে সিনার
(ক) ছাত্র (খ) শিক্ষক
(গ) পথ-প্রদর্শক (ঘ) বন্ধু।

৪। ইবনে সিনার গ্রন্থাবলীর ভাষা ছিল
(ক) গ্রীক (খ) ফারসি
(গ) আরবী ও ফারসি (ঘ) হিব্রু।

৫। ইবনে সিনার বয়স ছিল মাত্র
(ক) একান্ন বছর (খ) বাহাত্তর বছর
(গ) আটান্ন বছর (ঘ) ষাট বছর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইবনে সিনার জীবনী আলোচনা করুন।

২। তাঁর গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিন।

৩। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব ও অবদান আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

সত্য/মিথ্যা

১। মিথ্যা	২। মিথ্যা	৩। সত্য	৪। সত্য	৫। মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ক	২। গ	৩। খ	৪। গ	৫। গ

পাঠ-২

ইবনে সিনার যুক্তিবিদ্যা
Logic of Ibn Sina

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- যুক্তিবিদ্যা বলতে ইবনে সিনা কি বলতে চান তা বুঝতে পারবেন।
- তাঁর যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- তাঁর মতে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের সম্পর্ক কি তা বুঝতে পারবেন।

ভূমিকা

আল-কিন্দি এবং আল-ফারাবীর যুক্তিবিদ্যা আলোচনার সঙ্গে সংগতি রেখে ইবনে সিনা যুক্তিবিদ্যার ওপর তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। এ্যারিস্টটল এবং স্টয়িকদের যুক্তিবিদ্যার প্রভাব তাঁর যুক্তিবিদ্যায় স্পষ্ট। তিনি তাঁর কিতাব আল-সিফা, আল-নাজাত এবং আল-ইশারাত গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সংজ্ঞা, যুক্তিবিদ্যার কার্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করেন। জানা যায়, ইবনে সিনার যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত চিন্তাধারা এখনও পূর্ণরূপে বিকশিত করা সম্ভব হয়নি। কারণ তাঁর যেসব গ্রন্থে এ বিষয়ের চিন্তাধারা আলোচিত হয়েছে, সেসব গ্রন্থের অনেকাংশই এখনও অজানা। এখানে উল্লিখিত গ্রন্থের ভিত্তিতে যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত চিন্তাধারা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তাঁর যুক্তিবিদ্যার আলোচনা করা হল। যুক্তিবিদ্যার আলোচনা স্বভাবতই কঠিন। ইবনে সিনার চিন্তাধারাও খুব সহজ নয়। তবুও আমরা যতটুকু সম্ভব সরলভাবে তাঁর যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত অভিমত আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

ইবনে সিনা যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। তিনি আল-সিফা গ্রন্থে বলেন, 'যুক্তিবিদ্যাকে দর্শনের অংশ এবং এর হাতিয়ার (instrument) হিসেবে বিবেচনার মধ্যে কোন বিরুদ্ধবাদিতা নেই?' তিনি এখানে যুক্তিবিদ্যাকে 'দর্শনের অংশ এবং দর্শনের হাতিয়ার' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। যুক্তিবিদ্যাকে তিনি কোন সময় বিজ্ঞান বলেছেন, আবার কোন সময় কলা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তাঁর ফারসি ভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যাকে 'পরিমাপকের বিজ্ঞান' (Scales of Science) বলেন। ফারসি ভাষায় 'স্কেল' কথাটি 'তারাযু' কথাটির ইংরেজি অর্থ।

যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে ইবনে সিনা আরও সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যুক্তিবিদ্যা এমন ধরনের বিজ্ঞান যার মধ্যে জ্ঞাত দ্বারা অজ্ঞাতকে জানার ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়।' তিনি আবার বলেন যুক্তিবিদ্যা বুদ্ধির জন্য ভ্রমের বিরুদ্ধে প্রহরী হাতিয়ার (Guarding instrument against error) এবং এ বিদ্যা তাই যা যুক্তি ও পদ্ধতির সাহায্যে সত্য, বিশ্বাসে পৌঁছানোর পথে পরিচালিত করে। তিনি যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আরও বলেন যে 'যুক্তিবিদ্যা এমন এক বিজ্ঞান যা থেকে মানবীয় চিন্তাধারার নিয়ন্ত্রিত বিষয় থেকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিষয়ে উত্তরণের পন্থা শেখা যায়।'

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ইবনে সিনা উপরোল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়া যুক্তিবিদ্যার ওপর আর যেসব গ্রন্থ লিখেন সেগুলো হল– (১) আল-ইশারাত ওয়াল তানবিহাত, দানেশ নামেহ, মানতিক আল-

মাসরিকিয়িন এবং আল-হিকমাত আল-মাসারিকিয়্যা। এসব গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন সময়ে যুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করেন। এগুলোকে একত্রিত করে যুক্তিবিদ্যার একক সংজ্ঞা প্রদান করা আজও সম্ভব হয়নি।

ইবনে সিনা যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা প্রদানের পর যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনার প্রথমেই তিনি জ্ঞাত-তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, সমস্ত জ্ঞান এবং অবধারণ হল ধারণা অথবা সম্মতি (Assent tasdiq)। ধারণা হল প্রথম জ্ঞান যা সংজ্ঞার মাধ্যমে অর্জিত হয়। সম্মতি অর্জন করা যায় ন্যায় অনুমানের মাধ্যমে এবং তা একই পদ্ধতি অনুসরণ করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা সম্মত হই যে, সব কিছুর একটি প্রারম্ভ আছে। এভাবে সংজ্ঞা ও ন্যায়ানুমান এমন দুটি যমজ হাতিয়ার যার সাহায্যে জ্ঞাতব্য (knowledgeables) কে অর্জন করা যায় এবং এ জ্ঞাতব্য চিন্তনের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়।

ইবনে সিনা আবার বলেন, সমস্ত জ্ঞান হয় কতকগুলো অর্থপূর্ণ বিশেষ ভাবের বা ভাবনার ধারণা, না হয় এর প্রতি সম্মতি। সম্মতি ছাড়া ধারণা হয় এবং সকল সম্মতি ও ধারণা অনুসন্ধানের ফল হিসেবে অর্জিত হয় অথবা তারা পূর্বত:সিদ্ধ (a priori)। এখানে লক্ষণীয় যে ইবনে সিনা ধারণা এবং সম্মতিকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে গণ্য করেন এবং এরপর যুক্তিবিদ্যার মৌল বিষয় যেমন সংজ্ঞা ও ন্যায় অনুমানের সঙ্গে যুক্ত করেন।

ইবনে সিনা সংজ্ঞার (definition) প্রতি প্রভূত মনোযোগ দেন এবং এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি সংজ্ঞার পূর্ণ আলোচনার পূর্বে কতগুলো শব্দ চিহ্নিত করেন এবং এদের অর্থ নির্ধারণ করেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, শব্দ (লাফজ) এবং জাত্যার্থের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। তাঁর মতে তিনটি উপায়ে এসব শব্দের অর্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম উপায়টি হল দুটি শব্দের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য (accord-মুতাবাকা), দ্বিতীয়টি হল নিহিতার্থ (implication-তাদাসসুন) এবং তৃতীয়টি হল আনুষঙ্গিক বস্তু (ইলতিজাম)। তাঁর মতে, এই শব্দ একক বা যৌগিক হতে পারে। যৌগিক শব্দ সম্পূর্ণ যৌগিক হতে পারে আবার অসম্পূর্ণ কথনও হতে পারে। এসব শব্দ আবার বিশেষ যা সর্বজনীনও হতে পারে এবং সর্বজনীন অনিবার্য বা আকস্মিক হতে পারে।

প্রেডিকেশন বা বিধেয়ক সম্পর্কে ইবনে সিনা বলেন যে, প্রত্যেকটি বিধেয় হয় গঠনমূলক হবে, না হয় সহগামী বা আকস্মিক হবে। তিনি এ্যারিস্টটলের বিধেয়কের বিভাগকে গ্রহণ না করে পোরফাইরীয় বিভাগ অনুযায়ী বিধেয়কে পাঁচ ভাগে ভাগ করেন। তবে তিনি সব সময় পোরফাইরীয় বিভাগকে গ্রহণ করেননি। তিনি জেনাস বা জাতিকে Natural genus and Logical genus-এ বিভক্ত করেন। পোরফাইরীয় মতে, বিধেয়ক ছিল genus, species (জাতি, উপজাতি) differentia (জাত্যার্থ), property (গুণ) এবং accident (অবান্তর লক্ষণ)।

সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইবনে সিনা বলেন যে, বিভাগ (division), প্রতিপাদন (demonstration) এবং আরোহণ (induction)-এর মাধ্যমে সংজ্ঞা পাওয়া সম্ভব নয়। সংজ্ঞা এই তিনটির মিশ্রণ (combination) এবং এর ভিত্তি হচ্ছে অবিভাজ্য এককসমূহ (individuals)। ইবনে সিনা এ্যারিস্টটলের মত সংজ্ঞাকে বলেন–"a phrase signifying the essence of a thing" অর্থাৎ সংজ্ঞা হল, "কোন বস্তুর সারসত্তাকে তাৎপর্যমন্ডিত করে ভাষায় প্রকাশ করা"। তিনি ফারসি গ্রন্থে সংজ্ঞার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন যে, সংজ্ঞার উদ্দেশ্য হল কোন বস্তুর আসল সারসত্তার পরিচয় প্রদান করা।

সংজ্ঞার আলোচনার পর ইবনে সিনা জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস সম্মতির (assent) উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এ সম্মতি ন্যায় অনুমানভিত্তিক যুক্তির সাহায্যে অর্জন করা যায়। সম্মতির আলোচনা করতে গিয়ে

আসলে তিনি বিবরণমূলক সংজ্ঞার দিকেই অগ্রসর হন। তিনি বাক্যের সংজ্ঞা দেন এভাবে 'একটি বাক্য হচ্ছে এমন ভাষণ যার মধ্যে দুটি বস্তুর সম্পর্ক এমনভাবে আছে যে, এর মধ্যে সত্য বা মিথ্যা অবধারণ উৎসারিত হয় (relation between two things in a manner that a true or false judgement follows)।' স্টয়িকদের মতে বাক্য সত্য বা মিথ্যা হয়। কিন্তু ইবনে সিনা একেক্ষত্রে এক ধরনের ভিন্নমত পোষণ করে বলেন বা উপরোক্ত মতের সঙ্গে কিছু যোগ করে বলেন– "কোন ব্যক্তি যখন জিজ্ঞাসাবাদ (interrogation), প্রত্যাশা, অনুরোধ, বিস্ময় এবং এসবের মত আরও কিছু প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় না যে সে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী। তবে কেবলমাত্র আকস্মিকভাবে এরূপ বলা হতে পারে।'

স্টয়িকদের মত ইবনে সিনা বাক্যকে 'অ্যাটোমিক' এবং 'মোলেকুলার' এই দু'ভাগে ভাগ করেন এবং বলেন যে, প্রথমটির সাথে দ্বিতীয়টির সংযোগ আছে। তিনি মোলেকুলার বা আণবিক বাক্যকে আবার ক্যাটেগরিক্যাল বা নিঃশর্ত, হাইপথেটিক্যাল কনজাংটিভ এবং হাইপথেটিক্যাল ডিসজাংকটিভে বিভক্ত করেন। এ বিভাগও স্টয়িকদের বিভাগের মতই। ইবনে সিনা এখানেই ক্ষান্ত না হয়ে বাক্যের আরও যেসব বিভাগের কথা বলেন সেগুলো হল–সিংগুলার বা একক, বিশেষ, অনির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ বা কোয়ান্টিফাইড, মডাল, অ্যাবসোলিউট এবং আরও অনেকগুলো। এ্যারিস্টটলীয় বা স্টয়িকদের যুক্তিবিদ্যায় এসবের প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক প্রকার বাক্যকে তিনি তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবিত বলে দাবি করেন এবং এ বাক্যকে তিনি দি একজিসটেন্সিয়াল (অস্তিত্বশীল) বা উজুদিয়া বাক্য বলেন। খুব সম্ভবত আরবী ভাষায় 'কপুলা' বা সংযোগমূলক কোন শব্দ না থাকায় আরবীতে ব্যবহৃত to exist বা ওজাদা শব্দের ব্যবহার থেকে তিনি এ ধরনের 'অস্তিত্বশীল বাক্য' বা একজিসটেনসিয়াল বাক্যের উদ্ভাবন করেন। তাঁর কথার সমর্থনে তিনি বলেন, "A thing is either an existing thing; or a form derived from it existing in the imagination or in the mind.... or a sound signifying the form .... or a writing signifying the sound....'। এখানেই ইবনে সিনার চিন্তাধারার মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এখানে কোন সম্প্রদায় বা দার্শনিককে অনুকরণ করেননি।

ইবনে সিনার মতে কোন কিছুর প্রমাণের জন্য তিনটি পদ্ধতি কার্যকর। এদের একটি ন্যায় অনুমান (syllogism), দ্বিতীয় আরোহণ (induction-ইসতিকরা) এবং তৃতীয়টি সাদৃশ্যমূলক অনুমান (analogy বা তাসসীল)। এ্যারিস্টটলের অ্যানালাইটিক প্রিওরা গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি বলেন, ন্যায় অনুমান হচ্ছে ঘটনার বা বিবরণের সাহায্যে গঠিত বিবরণ যা থেকে স্বয়ং আরেকটি ঘটনা আবশ্যিকভাবে উৎসারিত হয়, ঘটনাক্রমে নয় এবং এ ধরনের ন্যায় অনুমান পূর্ণ বা অপূর্ণ হবে। তিনি এখানে এ্যারিস্টটলের সঙ্গে একমত নন। তিনি ন্যায় অনুমানকে দু'ভাগে ভাগ করেন– (১) ইকতিরানী (সংযুক্তির সাহায্যে) এবং ইসতিসনাঈ (পরিত্যাগের সাহায্যে)। তিনি বলেন– ইকতিরানী ন্যায় অনুমান এমন যার মধ্যে দুটি আশ্রয় বাক্যকে একত্রিত করা হয়। এতে একটি সাধারণ শব্দ এবং অন্যটি পৃথক শব্দ থাকে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, "সকলেই গঠিত" (everybody is formed) এবং "যা গঠিত তাই সৃষ্ট" (everything that is formed is created)। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, "সকলেই সৃষ্ট।" তিনি বলেন– ইকতিরানী ন্যায় অনুমান বিশুদ্ধ শর্তহীন বা বিশুদ্ধ প্রাকল্পিক বা উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত হয়। ইকতিরানী ন্যায় অনুমানকে তিনি তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন– (১) হাসালী (২) সারতী (৩) হাসালী সারতী। পরবর্তীকালের চিন্তাবিদগণ হাসালী ন্যায় অনুমানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এ অনুমানকে প্রমাণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। ইবনে সিনার মতে ইসতিসনাঈ ন্যায় অনুমানও দুটি আশ্রয়বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত। এদের একটি শর্তযুক্ত হয় এবং অন্যটি দুটি অংশের একটির বর্জনের মাধ্যমে হয়। এই অনুমানও শর্তহীন বা প্রাকল্পিক হয় এবং এটিই সেই অনুমান যাকে

excluded বা আল-মুসতাশনাত বলা হয়। তাঁর মতে, এ দু'প্রকার ন্যায় অনুমানের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। তিনি এই ইসতিসনাঈ ন্যায় অনুমানের ব্যাপারে সেকালের অন্যান্য চিন্তাবিদদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন।

ইবনে সিনা তাঁর যুক্তিবিদ্যায় Doctrine of the Quantification of the Predicate বা বিধেয়কের সংখ্যাকরণ মতবাদটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং বলেন, আরবী শব্দ সুর সীমাবদ্ধতার সংখ্যার তাৎপর্য বহন করে। যেমন "all" বা সমস্ত এবং 'not one' বা একটি নয় এবং 'কতক' (some) এবং সমস্ত নয় (not all)। একজন ভাষাবিদের মতে একটি বাক্য যা সুর দ্বারা গঠিত তা quantified and limited এবং এটি সাধারণ বা বিশেষ হয়।

ইবনে সিনা যে একজন প্রসিদ্ধ এবং বুদ্ধিমান যুক্তিবিদ ছিলেন তার প্রমাণ হল তিনি তাঁর যুক্তিবিদ্যায় প্রায় সব কিছুই আলোচনা করেন এবং এমনকি তাঁর আলোচনা থেকে অনুপপত্তির (fallacy) আলোচনাও বাদ পড়েনি। তাঁর যুক্তিবিদ্যার ওপর এ্যারিস্টটলীয় ও অন্যান্য যুক্তিবিদের মধ্যে পোরফাইরীর প্রভাব বিদ্যমান। তবে একথা বলা অত্যুক্ত হবে না যে, ইবনে সিনার যুক্তিবিদ্যার প্রভাবই পরবর্তীকালের প্রায় সমস্ত যুক্তিবিদদের গ্রন্থে স্পষ্ট এবং এক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনবদ্য।

অনুশীলনী

১। ইবনে সিনার অধিবিদ্যার সারসংক্ষেপ বের করে লিখুন এবং অধিবিদ্যা কি তা লিখুন।
১। ইবনে সিনার মতে যুক্তিবিদ্যা কি? তাঁর যুক্তিবিদ্যায় আলোচিত বিষয়বস্তুর বিবরণ দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য/মিথ্যা

১। ইবনে সিনা যুক্তিবিদ্যাকে শুধু কলা বলেন। সত্য/মিথ্যা

২। সিনার যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কীয় কোন গ্রন্থ ছিল না। সত্য/মিথ্যা

৩। ইবনে সিনার মতে জ্ঞান এবং অবধারণ হয় ধারণা, না হয় সম্মতি। সত্য/মিথ্যা

৪। ইবনে সিনা ন্যায় অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করেন। সত্য/মিথ্যা

৫। আরবী ভাষায় কপুলা আছে। সত্য/মিথ্যা।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ইবনে সিনার মতে যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে দর্শনের
(ক) অংশ (খ) বিভাগ
(গ) হাতিয়ার (ঘ) কোনটিই নয়।

২। ইবনে সিনার মতে জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস হল
(ক) ধারণা (খ) সংজ্ঞা
(গ) সম্মতি (ঘ) অবধারণ।

৩। ইবনে সিনার উদ্ভাবিত নূতন বাক্যের নাম
(ক) প্রাকল্পিক (খ) বৈকল্পিক
(গ) উজুদিয়া (ঘ) কোনটিই নয়।

৪। ইবনে সিনার উদ্ভাবিত দু'প্রকার ন্যায় অনুমানের প্রথমটি হল
(ক) ইকতিরানী (খ) হাসলী
(গ) সারতী (ঘ) কোনটিই নয়।

৫। ইবনে সিনার মতে শব্দের অর্থ প্রকাশিত হয়
(ক) বৈকল্পিক উপায়ে (খ) কাল্পনিক উপায়ে
(গ) তিনটি উপায়ে (ঘ) একটি উপায়ে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইবনে সিনার মতানুসারে যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দিন।
২। সংজ্ঞা সম্পর্কে ইবনে সিনার বক্তব্য আলোচনা করুন।
৩। ইবনে সিনার মতে বাক্য কি? এ ব্যাপারে তাঁর অভিমত আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

সত্য/মিথ্যা

১। মিথ্যা ২। মিথ্যা ৩। সত্য ৪। সত্য ৫। মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। গ ২। গ ৩। গ ৪। ক ৫। গ

পাঠ-৩

ইবনে সিনার অধিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব

Metaphysics and Natural Religion of Ibn Sina

উদ্দেশ্য

এ পাঠশেষে আপনি

- ইবনে সিনার মতে দর্শনের সঙ্গে অধিবিদ্যার সম্পর্ক কি জানবেন।
- তাঁর অধিবিদ্যা কি তা অবগত হবেন।
- তাঁর অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু কি তা জানতে পারবেন।

ভূমিকা

মুসলিম জগতের চিন্তাবিদগণ গ্রীক দর্শনের আরবীতে অনূদিত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করার পর দার্শনিক যুক্তি ও প্রত্যাদেশের মধ্যে বিরোধ দেখতে পান। এ বিরোধের মীমাংসার পথ অনেকেই অন্বেষণ করেন আবার ধর্ম বিরোধী বলে অনেকে গ্রীক দর্শনকে পরিহার করেন। যারা যুক্তির সঙ্গে অবতীর্ণ গ্রন্থের চিন্তাধারার সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন তাঁদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, কেবলমাত্র অধিবিদ্যার মধ্যেই এই দুটির সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। কারণ ধর্মের মূলনীতি সমূহের যৌক্তিক প্রমাণ ও এর যথার্থতা এখানে আছে। এখওয়ানুস সাফার চিন্তাবিদগণ মনে করেন এই দু'বিরোধী বিষয়ের সমন্বয় সম্ভব এবং তা করা উচিত। দার্শনিকবৃন্দের মধ্যে আল-কিন্দি ও আল-ফারাবীসহ ইবনে সিনার পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ মনে করেন যে, ধর্মের মূলনীতিসমূহ যুক্তিভিত্তিক দর্শন থেকে পৃথক, কিন্তু এ দুটি একে অন্যের পরিপূরক। ইবনে সিনা অধিবিদ্যা সম্পর্কে বলেন যে, ধর্মীয় আইন বা শরীয়াহ্ এবং যুক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কারণ যুক্তির মধ্যে এমন কিছু নেই যা বিরোধ সৃষ্টি করে। যারা বিরোধিতা অন্বেষণ করেন তারা নিজেরাই বিপথগামী। ইবনে সিনা এভাবে এ ধরনের বিরোধ দূর করে দর্শনকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন– (১) উচ্চতর বিজ্ঞান বা অধিবিদ্যা, (২) মধ্যবর্তী বিজ্ঞান বা গণিতশাস্ত্র এবং (৩) নিম্নতর বিজ্ঞান বা প্রকৃতির অবভাস। তিনি বিভ্রান্তি দূর করার জন্য অধিবিদ্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে Science of the Divine বা পবিত্রতমের বিজ্ঞানকে অত্যধিক গুরুত্ব দেন। তিনি খোদার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য পদার্থবিদ্যা এবং অধিবিদ্যাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন যা অন্য কোন মুসলিম দার্শনিক করেননি। ইবনে সিনা রাসেলের বহুপূর্বে অধিবিদ্যাকে "No man's Land"-এ মনে করে বিজ্ঞানকে ধর্মতত্ত্ব থেকে পৃথক করেন এবং মনে করেন এ দুয়ের মধ্যে আছে একটি "Strip-narrow and unmarked where upon they meet"।

আল-কিন্দির মতে অধিবিদ্যা হল ঐ সত্তার বিজ্ঞান যা অচালিত এবং এ বিজ্ঞান প্রথম সত্য (First Truth)-এর বিজ্ঞান। আল-ফারাবী অধিবিদ্যাকে তিনটি অংশে বিভক্ত করে পরিশেষে বলেন যে, এ বিজ্ঞান ঐ পরম সত্তার বিজ্ঞান যে সত্তা অন্য কোন সত্তা থেকে তাঁর অস্তিত্ব অর্জন করেনি; বরং এ সত্তা ঐ সত্য যে সত্য থেকে সব কিছুই সত্যতা লাভ করে এবং এ মহাসত্য হচ্ছে খোদা। ইবনে সিনার মতে আত্মা যে 'প্রথম ইন্দ্রিয়জ' ও কতিপয় জ্ঞানের প্রথম স্তর অর্জন করে তা হল সত্তার ধারণা এবং এ ধারণাই অধিবিদ্যার প্রথম এবং সত্য বিষয়। এ সত্তা পরিপূর্ণ সত্তা–কারণ এ সত্তা আদতেই পরিপূর্ণ সত্তা (Absolute Being)। তাঁর এ ধারণার সূত্র ধরে বলা যায় যে, প্লেটোর অধিবিদ্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু যদি ধারণাতত্ত্ব হয় এবং এ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যার মূল উপাদান যদি সম্ভাবনা থেকে বাস্তবতায় উত্তরণ

হয় তবে ইবনে সিনার অধিবিদ্যার মূল উপাদান হল সত্তার ধারণার অনুসন্ধান এবং তাঁর অধিবিদ্যা হল সত্তাকে সত্তা হিসেবে অধ্যয়ন (study of being as being)।

অধিবিদ্যার সংজ্ঞা দেওয়ার পর ইবনে সিনা অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কি আলোচনা করেন সে সম্পর্কে আমরা এখন ধারণা লাভ করব। ইবনে সিনার অধিবিদ্যার আলোচনা বিস্তারিত। তাঁর অধিবিদ্যার মূল বিষয়বস্তু আলোচনার পূর্বে তিনি এ্যারিস্টটলের মত ভূমিকা হিসেবে কতকগুলো বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। এ বিষয়গুলো হল– সত্যতা এবং 'সত্য' (Truth and the true), সারধর্ম এবং অস্তিত্ব (essence and existence), কারণের বিভাজন (classification of causes), দ্রব্য-আকস্মিক (substance-accident) সম্পর্ক, জড় ও আকার (Matter and Form), জড় ও আকারের সঙ্গে যুক্ত সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা (potentiality and actuality), সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতার পূর্বাপর অবস্থান (Whether potentiality precides actuality or nice hersa), এক এবং বহু (one and the multiple) এবং সংজ্ঞা ও সংজ্ঞায়িত (definition and that which is being defined)। উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোচনা মূলত এ্যারিস্টটলের আলোচনাকে অনুসরণ করেই করা হয়েছে। কিন্তু ইবনে সিনা এ্যারিস্টটল, স্টয়িক দার্শনিক বা ফারাবীর মতবাদ গ্রহণ করেছেন এমন কথা বলা যাবে না। তবে উপরোক্ত দার্শনিকদের চিন্তাধারার ছাপ (trace) তাঁর অধিবিদ্যায় লক্ষ্য করা যায়।

ইবনে সিনা তাঁর অধিবিদ্যার মূল উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন- সত্তার ধারণা হল মানব মনের প্রথম 'অর্জন' (acquisition)। সত্তার ধারণার জ্ঞান বিষয়গত এবং বিষয়ীগতভাবে অর্জন করা হয়। তিনি বলেন যে, আমরা আমাদের দেহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন থাকলেও আমরা এ বিষয়ে ওয়াকিফহাল যে আমরা 'আছি' এবং আমরা 'অস্তিত্ববান'। বস্তুগতভাবে সত্তার ধারণা লাভ করা যায়–সংবেদীয় প্রত্যক্ষণ এবং চতুরপার্শ্বের বস্তুর সঙ্গে দেহজ সংস্পর্শের মাধ্যমে। ইবনে সিনা বলেন সত্তা কোন জাতি নয় এবং একে উপজাতিতে ভাগ করা যায় না। কিন্তু সত্তার মধ্যে দুটি উপাদান আছে। এদের একটি 'সারসত্তা' এবং অন্যটি 'অস্তিত্ব' (essence and existence)। সত্তাকে বিশ্লেষণ করার সময় এরূপ মনে হয়। কিন্তু সত্তাকে পর্যবেক্ষণ করলে প্রশ্ন ওঠে এ সত্তা কি আবশ্যক না সম্ভব। যদি আবশ্যক হয় তবে সত্তা নিজ গুণে আবশ্যক নাকি বাহ্যিক কোন agencey প্রতিনিধিত্বের ফলে আবশ্যক? তিনি বলেন আমরা এ প্রশ্ন থেকে তিন ধরনের সত্তা পেতে পারি। এগুলো হল 'আবশ্যিক', 'সম্ভব' এবং 'অসম্ভব'। কিন্তু স্বয়ং আবশ্যক, স্বয়ং সম্ভব এবং পৃথক কোন এজেন্টের কর্মের ফলে আবশ্যক-এর মধ্যে হস্তক্ষেপকারী প্রক্রিয়া আছে এবং এ প্রক্রিয়াকে 'সৃষ্টি' বা creation বলা হয়। ইবনে সিনা প্রশ্ন করেন এ প্রক্রিয়া কি সচেতন না প্রত্যক্ষ (direct)? তাঁর মতে এ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ ও আবশ্যক কারণ সর্বোচ্চ আবশ্যক সত্তা যাকে স্বয়ং খোদা বলা হয়– তাঁর নিকট থেকে নির্গমনের পর্যায়ক্রমিক স্তরের মাধ্যমেই এ সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইবনে সিনা এখানে তাঁর অধিবিদ্যার মৌলিক তিনটি বিষয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন।

সত্তার ধারণা

সারধর্ম (essence) এবং অস্তিত্বের সমন্বয়ে সত্তার ধারণা গঠিত। কোন বস্তুর বাস্তবতা (reality) যা সত্য তা এর মধ্যে আছে এবং এখানেই তার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি ত্রিভুজের বাস্তবতা হল যে ত্রিভুজটি আছে এবং শ্বেতবর্ণের বাস্তবতা হল এটি শ্বেতবর্ণ (Whiteness)। ইবনে সিনা একে বিশেষ অস্তিত্ব বলেন কারণ বস্তু বলতে যা বুঝায় তাঁর সঙ্গে 'অস্তিত্বের ধারণা' (notion of existence) সংযুক্ত, যদিও বস্তু এবং বস্তুর অস্তিত্বের ধারণা দুটি সম্পূর্ণ আলাদা। অস্তিত্বশীল সত্তার ধারণা বস্তুর সঙ্গে সহযোগী। কারণ বস্তুটি যদি বাস্তবে অস্তিত্বশীল না হয় কল্পনা এবং মনের মধ্যে অস্তিত্ববান। যদি তা না হয় তবে এটি কোন বস্তু নয়। ইবনে সিনা বলেন এমন কোন

বস্তু আছে কি যা সম্পূর্ণরূপে অনস্তিত্বশীল (non-existent)? কোন বস্তু সম্পর্কে মনের মধ্যে ধারণা থাকতে পারে কিন্তু বস্তুটি আসলেই বহির্জগতে অস্তিত্বশীল নয়। কেবলমাত্র ঐ বস্তুরই তথ্য পাওয়া সম্ভব যা মানসিকভাবে বোধগম্য (mentally realized)। আর যে বস্তু সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বশীল, তার সম্পর্কে কোন তথ্য দেওয়া যায় না। এ অবস্থায় যদি মনে করা হয় যে কোন অস্তিত্বশীল বস্তুর তথ্য দেওয়া যায় তাহলে ঐ বস্তুর গুণ থাকবে এবং যদি তা থাকে, তবে ঐ অনস্তিত্বশীল বস্তুর সঙ্গে ঐ গুণ সংযুক্ত হবে। এর অর্থ হল ঐ অনস্তিত্বশীল বস্তুর অস্তিত্ব আছে যা আসলে অসম্ভব (absurd)। ইবনে সিনা বলেন যে প্রত্যেক বস্তুর বিশেষ বাস্তবতা আছে এবং এটি এর সারধর্ম। এটি জানা কথা যে, প্রত্যেক বস্তুর বাস্তবতা এর অস্তিত্ব (wujud) থেকে আলাদা বা এটি অন্য কিছু। এখানে ইবনে সিনা বস্তুর অস্তিত্ব থেকে বস্তুর সারধর্মকে পৃথক করে দেখান এবং এ ব্যাপারে তাঁর পৃথকীকরণ পদ্ধতি তত্ত্বমূলক যা এ্যারিস্টটলের পদ্ধতি থেকে পৃথক। এটি ইবনে সিনার একটি অসাধারণ অবদান।

উপরোক্ত আলোচনার পর ইবনে সিনা সারধর্ম এবং অস্তিত্বের প্রকৃত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে সারধর্ম হল বাস্তবতা। সারধর্ম কি এর উত্তরে বলা যাবে এটি যা তাই (it is what it is)। কোন বস্তুর সাধারণ গুণাবলীর সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেলা যাবে না। কারণ একটি বস্তুর অনেক গুণ থাকতে পারে যা ঐ বস্তুর জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এই বস্তু কোন একটি নয় বরং সারধর্ম হচ্ছে ঐ বস্তুর সমস্ত অপরিহার্য গুণের সমষ্টি (sum-total)। ইবনে সিনা বলেন কেউ যদি প্রশ্ন করেন সারধর্ম কি (what it is)? এর উত্তর তিনটি আকারে দেওয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে পুরোপুরি বিশেষ প্রথায়; যেমন– যৌক্তিক প্রাণী (reasonable animal) 'মানুষ'কে ব্যক্ত করে (denotes), উত্তরের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রাপ্ত সাধারণ উপাদান যাকে সারধর্ম বলা হয়। উত্তরের তৃতীয় আকারটি হচ্ছে 'সারধর্ম', যা বিশেষ এবং সাধারণ উপাদানের সমন্বিত একক।

সারধর্ম সম্পর্কে ইবনে সিনার উপরোক্ত ধারণা এ্যারিস্টটলের অনুরূপ। কিন্তু ইবনে সিনার সাথে এ্যারিস্টটলের পার্থক্য হল ইবনে সিনা সারধর্ম এবং অস্তিত্বের পার্থক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন যা এ্যারিস্টটল করেননি। আধুনিক দার্শনিকদের মতে কোন শব্দের সারধর্ম থাকতে পারে কোন বস্তুর নয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, তাঁর যুগে এ ধরনের ধারণা বাস্তব ও দর্শনের জন্য সহায়ক ছিল।

সারধর্মের সংজ্ঞা দেওয়ার পর ইবনে সিনা অস্তিত্ব কি সে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁর মতে, অস্তিত্বশীল তাই যাকে সংবেদনসমূহ প্রত্যক্ষ করে (senses perceive)। তিনি বলেন এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব গ্রহণযোগ্য নয় যাকে তার দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যাবে না। কোন দেহের স্থান বা অবস্থান চিহ্নিত করা না গেলে এর অস্তিত্ব আছে বলে ধরা যাবে না। মানুষের অনন্য বাস্তবতা বা মূল বাস্তবতা সংখ্যার সঙ্গে পরিবর্তনশীল নয়, কারণ এ বাস্তবতা (reality) পূর্ণরূপে বোধজাত। সকল সর্বজনীনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সকল যথার্থ সত্তা কেবলমাত্র এর অপরিহার্য বাস্তবতা অনুযায়ী সত্য। ইবনে সিনা বলেন যে, এ কথা অনুযায়ী সকলেই একমত যে কেবলমাত্র 'তিনিই এক' (আল্লাহ এক) এবং তাঁর ব্যাপারে কোন কিছু নির্দেশ করা যাবে না। তা যদি হয় তবে কোন কিছু কিভাবে তাঁর নিকট থেকে তার অস্তিত্বের সত্যতা অর্জন করে বা অস্তিত্ব লাভ করে?

Quality এবং বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে কোন বস্তুর উদ্ভব হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি ত্রিভুজের বাস্তবতা সমতল ভূমি ও লাইনের সঙ্গে জড়িত এবং এগুলোই ত্রিভুজ গঠন করে। এ ত্রিভুজতত্ত্বের বাস্তবতা আছে। এ দু'টির একটিকে উপাদান এবং অন্যটিকে আকারগত কারণ বলা যায়। কিন্তু এর অস্তিত্ব আরও কিছু কারণের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এগুলো ত্রিভুজত্বের জন্ম দেয় না

এবং এর সংজ্ঞারও অংশ নয়। এটিই হল সীমিত কারণ বা পরিণতি কারণ এবং পরিণত কারণ নিমিত্ত কারণের জন্যই নিমিত্ত কারণ।

কোন বস্তু বাস্তবে অস্তিত্বশীল কিনা তা জানতে হলে, ইবনে সিনার মতে, এটা লক্ষ্য রাখা উচিত যে, যে জন্মদানকারী উপাদান কোন বস্তুর অস্তিত্ব আনয়ন করে, তার গঠনমূলক কারণ আছে। এ ব্যাপারে কারণগুলোর কোন কোনটি থাকতে পারে, যেমন– আকারের কথা বলা যায় অথবা অস্তিত্ব প্রদানকারী সবগুলো কারণও হতে পারে। পরিণতি কারণের প্রয়োজনেই বস্তুর অস্তিত্ব এবং ঐ পরিণতি কারণ মূল বা সারধর্মের জন্যই কারণ। তিনি বলেন সীমিত কারণই পরিণতি কারণের অস্তিত্বের কারণ যা মূলত মুখ্য কারণ। ইবনে সিনার মতে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নিমিত্ত কারণই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং সিদ্ধান্তই নিয়ামক কারণ। আকার, উপাদান এবং পরিণতি কারণকে নিমিত্ত কারণ বা এজেন্টের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয় না। ইবনে সিনা এখানে জোর দিয়ে বলেন যে, এই নিমিত্ত কারণই হচ্ছে 'প্রথম কারণ' (First cause)। এ কারণই সকল অস্তিত্বের কারণ এবং সমুদয় অস্তিত্বশীল বস্তুর বাস্তবতার কারণ। ইবনে সিনা এ কারণকেই খোদা বলেন।

সত্তার প্রকারভেদ

সত্তার সারধর্ম এবং অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনার পর ইবনে সিনা সত্তার প্রকার নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে সত্তা 'আবশ্যিক', 'সম্ভব' অথবা 'অসম্ভব' হতে পারে। সত্তা জাতি নয় বিধায় এগুলো তার উপজাতি নয়। বিষয়ীগতভাবে এগুলো সত্তার বিভিন্ন আকার যা মানসিকভাবে ধারণামাত্র। বস্তুগতভাবে এগুলো বিভিন্ন উপায় যার মধ্যে ঐগুলো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

'আবশ্যিক সত্তা' হচ্ছে সেই সত্তা যাকে অস্তিত্বশীল ভাবা অসম্ভব ব্যাপার। সম্ভাব্য সত্তা হচ্ছে সেই সত্তা যাকে অস্তিত্বশীল বা অস্তিত্বহীন ভাবা কোন প্রকার অসম্ভব ব্যাপার নয়। 'অসম্ভব সত্তা' বলতে এমন কিছুকে বুঝায় যার কোন অস্তিত্ব নেই এবং অস্তিত্বময়কে সবসময় অস্তিত্বহীনের চেয়ে স্পষ্টভাবে এবং ভালভাবে জানা যায়।

আবশ্যিক সত্তা সম্পর্কে ইবনে সিনা বলেন যে এই প্রকার সত্তা স্বয়ং আবশ্যিক হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। সারধর্মের মধ্যে এ সত্তা আবশ্যিক হলে এ সত্তাকে কখনও অসম্ভব ভাবা যাবে না। কিন্তু সারধর্মের মধ্যে এ সত্তা আবশ্যিক না হলে এ সত্তাকে অন্য কিছুর সঙ্গে যুক্ত করলে তা আবশ্যিক হয়। উদাহরণস্বরূপ 'চার' সংখ্যাটি সারধর্মের মাধ্যমে নয় বলে আবশ্যিক নয়। কিন্তু দুই-এর সঙ্গে দুই যোগ করলে যখন 'চার' হয় তখন এ সংখ্যাটি আবশ্যিক হয়। একইভাবে একটি সম্ভাব্য সত্তা তখনই সম্ভাব্য সত্তা হবে যখন এর অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতার মধ্যে অসম্ভবের কোন উপাদান থাকবে না। অন্যকথায় এটি সম্ভাবনাময় এবং কোন প্রকার সত্তায় উন্নীত হতে পারে। অধিকন্তু একটি বস্তু সারসত্তার মধ্যে এবং একই সঙ্গে অন্য কিছুর সাথে আবশ্যিক সত্তা হতে পারে না। কারণ পরবর্তীতে এ 'অন্য কিছু' যদি দূরীভূত হয়, তবে এ সত্তা আর আবশ্যিক সত্তা থাকে না। ইবনে সিনার মতে, প্রত্যেক বস্তু যা অন্য কিছুর সংযোগে আবশ্যিক সত্তা, তা আবার সারসত্তায় সম্ভাব্য সত্তা। এটি এ কারণে যে আবশ্যিকতার অস্তিত্ব অন্য বস্তুর সংযোগ বা সম্পর্কের সাথে যুক্ত এবং 'স্বয়ং কোন বস্তুর সারসত্তার' মত সংযোগ এবং সম্পর্কের একই রকম বিবেচনা থাকতে পারে না।

উপরোক্ত কথার মাধ্যমে ইবনে সিনা বলতে চান যে, সারসত্তার যে আবশ্যিক সত্তা তা অবশ্যই আবশ্যিক। কিন্তু এ আবশ্যিক সত্তা অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত বা সম্পর্কিত হয়ে সারসত্তায় তা সম্ভাব্য সত্তায় পরিণত হয়। আবশ্যিক সত্তার অস্তিত্বের প্রকাশ অবশ্যই প্রয়োজনীয় বলে এটি আদিতেই ঐ অবস্থায় ছিল এবং এটি অস্তিত্ববান হয়েছে। সারধর্মের মধ্যে সম্ভাব্য সত্তা অস্তিত্ববান হলে তা

আবশ্যিক সত্তায় রূপান্তরিত হয়। আর সম্ভাব্য সত্তা অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সম্ভাবনার মধ্যে বিরাজমান। ইবনে সিনা এই আবশ্যিক এবং সম্ভাব্য সত্তাকে এ্যারিস্টটলীয় ধাঁচে বাস্তবতা এবং সম্ভাব্যতার (Actuality and potentiality) সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। কিন্তু পরিশেষে আবশ্যিক সত্তাকে প্রকৃতভাবেই আবশ্যিক বলে প্রমাণ করেন এবং এ সত্তাকে প্রথম কারণ হিসেবে খোদা বলে অভিহিত করেন। আর অস্তিত্বশীল সমস্ত সৃষ্টিকে সম্ভাব্য সত্তা বলে অভিহিত করেন। বাস্তবতা হিসেবে আবশ্যিক সত্তাকে তিনি 'বিশুদ্ধ মঙ্গল' বলেন এবং তাঁর মতে সম্ভাব্য সত্তার মত এ সত্তার কোন কারণ নেই; এর অস্তিত্ব শর্তসাপেক্ষ নয়, আবার এ সত্তা অন্য কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েও সত্তা নয় বলে পরিবর্তনশীলও নয়। আবার বহুও নয় বরং এক।

ইবনে সিনার মতে আবশ্যিক সত্তা বা প্রথম কারণ এবং সম্ভাব্য সত্তার মধ্যে একটি স্তর ও একটি প্রক্রিয়া জড়িত। উভয়ের মধ্যস্থিত এই স্তর ও প্রক্রিয়ার নাম হল সৃষ্টি। সৃষ্টি (creation) অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। প্রশ্ন হল কেমন করে কোন কিছুর অস্তিত্ব আনয়ন করা যাবে? তাঁর মতে, সৃষ্টির জন্য উপাদানের বা জড় (matter) প্রয়োজন। এই জড় তাঁর মতে চিরন্তন। ইবনে সিনা প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের মতই মনে করেন যে, সৃষ্টির অর্থ শূন্য থেকে সৃষ্টি নয় বরং পূর্বে অবস্থিত জড়ীয় উপাদান থেকেই কোন সময়ে সৃষ্টি বলতে যা বোঝায় তা হয়েছে। তিনি এখানে সময়ের ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করেন এবং এ্যারিস্টটলীয় ধাঁচে তাঁর তত্ত্ব দেন। যাহোক, তিনি সৃষ্টি বলতে মূলত পূর্বে অস্তিত্বশীল জড়কে আকার প্রদান করা অর্থে বুঝিয়েছেন। এ আকার প্রদান করেন নিমিত্ত কারণ বা খোদা। খোদা এখানে একজন Artificer; তিনি শূন্য (Ex-nihilo) থেকে সৃষ্টিকর্তা নন। তিনি তাঁর তত্ত্বে অভিনবত্ব বজায় রাখার জন্য খোদাকে একই সাথে নিমিত্ত কারণ এবং আবশ্যিক সত্তা বলে অভিহিত করেন। কারণ এ দুটি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

এ্যারিস্টটলের মত তিনিও মনে করেন যে, সৃষ্টির জন্য কারণের প্রয়োজন। কিন্তু কারণের আবার কারণ থাকতে পারে। সেজন্য প্রথম কারণের প্রয়োজন এবং এ প্রথম কারণের কোন কারণ নেই। তাই প্রথম কারণই চূড়ান্ত কারণ। যিনি সব কারণেরই কারণ এবং তিনিই খোদা। এই খোদা একই সাথে নিমিত্ত কারণ এবং পরিণতি কারণও বটে। সে হিসেবে খোদা সব কারণের কারণ এবং সব পরিণতির পরিণতি এজন্য যে তিনি চিরস্থায়ী।

সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় খোদা Active Intelligence বা চালক শক্তির মাধ্যমে পূর্বে অস্তিত্বশীল জড়ের আকার প্রদান করেন। তাঁর এই Active Intelligence বা চালক শক্তি হচ্ছেন আকার প্রদানকারী। ধর্মতত্ত্ববিদগণ খোদাকে নিমিত্ত কারণ হিসেবে চিন্তা করে বলেন যে তিনি শূন্য থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সব কিছু সৃষ্টি করেন। ইবনে সিনা কিছুটা ভিন্নভাবে বলেন যে খোদা পুরাতন আকারকে সরিয়ে Active Intelligence বা চালক শক্তির মাধ্যমে নূতন আকার দান করেন। এ থেকে বুঝা যায় ইবনে সিনা খোদাকে সর্বক্ষমতাবান মনে করেন, তবে তিনি শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি করেন না (does not create ex-nihilo)।

এরপর ইবনে সিনা খোদার নিকট থেকে কিভাবে জগৎ অস্তিত্ববান হল সে সম্পর্কে তাঁর অধিবিদ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেন। ইবনে সিনা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার জন্য অন্যান্য মুসলিম দার্শনিকদের মতই নির্গমন তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করেন।

খোদা বা আবশ্যিক সত্তা এক এবং অদ্বিতীয়। তাহলে এই অদ্বিতীয়ের মধ্য থেকে বহু বিচিত্র বস্তুর সৃষ্টি কিভাবে হল? ইবনে সিনা বলেন, খোদা এক বিশুদ্ধ চিন্তনের মাধ্যমে First intelligence বা বিশ্ব-আত্মা সৃষ্টি করেন। এ বিশ্ব-আত্মা এক এবং সরল। বিশ্ব আত্মা এর সারসত্তার প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য, কিন্তু

আবশ্যিক সত্তার সংযোগে আবশ্যিক। আবশ্যিক আত্মা থেকে নির্গমনের মাধ্যমে বিশ্ব-আত্মা প্রয়োজনীয়তা (necessity) এবং সম্ভাবনার (possibility) অধিকারী এবং এজন্য এই আত্মা একাধারে এক এবং বহু। একইভাবে একই প্রক্রিয়ায় ঐ আত্মার মতই শক্তি নিয়ে দ্বিতীয় শক্তির নির্গমন হয়। এরূপে বিশ্ব-আত্মা থেকে তিনটি বস্তুর নির্গমন হয়: (১) দ্বিতীয় শক্তি (২) প্রথম পরিমন্ডলের আত্মা যা এর আকার এবং (৩) এর দেহ যা এর উপাদান। একইভাবে দ্বিতীয় শক্তি থেকে তৃতীয় শক্তির উৎসারণ হয় এবং অন্য একটি পরিমন্ডলের আকার ও দেহের নির্গমন হয়। এভাবে এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং এর সমাপ্তি ঘটে শেষশক্তির নির্গমন পর্যন্ত। এই শেষশক্তি থেকে আমাদের আত্মার নির্গমন হয়। এই শেষশক্তি পৃথিবীর পরিমন্ডলের শক্তি যাকে চালক শক্তি বলা হয়। পৃথিবী সসীম বলে এবং আর কোন শক্তির নির্গমনের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে এখানে আর কোন শক্তির উৎসারণ হয় না।

ইবনে সিনার মতে এসব শক্তি অন্ধভাবে পরিচালিত নয়। বরং এ পৃথিবীতে শৃঙ্খলা স্থাপনের এবং মঙ্গল সাধনের জন্যই এগুলোর নির্গমন। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাধীন পরিমন্ডল আছে জড় ও আকারসহ। এই আকার এর আত্মা। মর্যাদা (rank) ও ক্রমের দিক দিয়ে এদের পার্থক্য আছে এবং একটির চেয়ে অপরটি বেশি প্রয়োজনীয়। এসব শক্তির মাধ্যমেই এ বিশ্বের বৈচিত্র্যময় বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথম শক্তি বা first intelligence স্বয়ং খোদার নিকট থেকে উৎসারিত। তাই খোদার সাথে এর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। কিন্তু অন্যান্য শক্তির সঙ্গে খোদার সম্পর্ক পরোক্ষ। খোদার সর্বক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সৃষ্ট শক্তির প্রক্রিয়ায় বা প্রকৃতি বিরোধী কোন কিছু করেন না। ইবনে সিনার দর্শনের বিশেষত্ব এখানেই।

ইবনে সিনার অধিবিদ্যার আলোচনা শেষ করার পূর্বে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার। প্রশ্নটি হচ্ছে–আল্লাহ যে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বিশ্ব এবং এর মধ্যস্থিত বস্তুসমূহের সৃষ্টি করেছেন তাতে তিনি বিশ্বের সমুদয় ব্যক্তি বা বস্তুর জ্ঞান কি রাখেন বা এদের সম্পর্কে তিনি কি সচেতন? ইবনে সিনা এর উত্তরে বলেন যে, এ বিশ্ব সম্পর্কে আল্লাহ্‌র অনবহিত হওয়ার কোন কারণ নেই। বিশ্বের খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ব্যাপকতাময় (আসুমী)। মানুষের মনে বস্তুর জ্ঞান একের পর এক এবং প্রমাণের মাধ্যমে আসে। কিন্তু খোদার নিকট জ্ঞান আসে এক সঙ্গে এবং দেশকাল নিরপেক্ষভাবে। অন্যদিকে সমগ্র বিশ্ব সত্তার জন্য ঐশী সত্তার প্রেমানুভূতি থাকায় তিনি সব কিছুকে নিজস্ব পরিব্যাপ্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছেন। বিশ্বের সব কিছুর জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে সিনা নব্য প্লেটোবাদীদের তত্ত্বের অনুসরণ করে বলেন– আল্লাহ আত্মপ্রকাশের প্রয়াসী বলে তাঁর সৌন্দর্য সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়। এর ফলে সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের মধ্যেই অস্তিত্ববান।

প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব

ইবনে সিনার অধিবিদ্যা আলোচনার পর আসুন এবার আমরা তাঁর একটি নতুন ধারণার ব্যাপারে কিছুটা চিন্তা করি। এ নতুন ধারণাটি হচ্ছে প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে।

প্রকৃতি থেকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা সম্পর্কীয় আলোচনা বা যুক্তির সাহায্যে পরম সত্তার ধারণায় উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত বিশ্লেষণকে প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব বলা যেতে পারে। প্রকৃতি থেকে পরম সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়ার বিষয়টির ইঙ্গিত পবিত্র কোরানের কোথাও কোথাও স্পষ্টভাবেই করা হয়েছে। বিভিন্ন যুগের মুসলিম চিন্তাবিদগণ কোরানের এই ইঙ্গিত অনুসারে প্রকৃতি থেকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টাও করেছেন। বর্তমান যুগের অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ পদার্থ বিজ্ঞানকে ইসলামিক ভাবধারায় অন্তর্ভুক্ত মনে করেন যারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণায় নিয়োজিত। তাঁরাও মুসলিম বলে অভিহিত। প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্বের প্রবক্তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে,

ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও দর্শনের স্বাধীন চিন্তার মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। বরং এ দুটি এক ও অভিন্ন এবং উভয়েই পরমসত্তার ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম।

খুব সম্ভবত ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপনের তাগিদে বা প্রত্যাদেশের সাহায্যে অবতীর্ণ ধর্মের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনযোগ্য করে তোলার মানসে মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ইবনে সিনা তাঁর চিন্তাধারায় প্রত্যাদেশ ছাড়াও পরমসত্তার ধারণায় পৌঁছানো সম্ভব বলে চিন্তা করার অবকাশের সৃষ্টি করেন। ফলে ইবনে সিনার পরবর্তী যুগে কেউ কেউ মনে করেন যে, আল্লাহ যদি তাঁর নবীদের মাধ্যমে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করে নিজেকে প্রকাশ নাও করতেন, তবুও দার্শনিকগণ, মরমীসাধক ও বৈজ্ঞানিকগণ-প্রকৃতি, বিশ্বজগৎ ও মানস্বাকে অনুধাবনের মাধ্যমে তাঁকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হতেন। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ এবং তাঁকে জানার জন্য এটিই হচ্ছে অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি। প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ববাদীদের মতে আল্লাহ হচ্ছেন বিশ্ব জাগতের ঐক্য বিধায়ক শক্তি এবং সত্য দার্শনিকগণ সহজেই তা অনুধাবন করতে পারেন। মরমী সাধকগণ তন্ময়তার দ্বারা আল্লাহর পরিচয় ও নৈকট্য লাভ করেন বা তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। ইবনে সিনার মতে মরমী সাধকদের আত্মা নিশ্চিতরূপেই ঐশী আত্মায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

উপরোক্ত চিন্তাধারাকে স্পষ্টরূপে অনুধাবন করার জন্য ইবনে সিনা 'হাই ইবনে ইয়াকযান' শীর্ষক একটি উপন্যাস লিখেন। পরবর্তী যুগে ইবনে তোফায়েল একই শিরোনামে আরও স্পষ্টরূপে উপরোক্ত চিন্তাধারা প্রকাশের মানসে একটি উপন্যাস লিখেন। সে যাহোক, ইবনে সিনা তাঁর গ্রন্থে এ ধারণা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন যে, ব্যক্তিজীবনের দুর্ভোগ ও দু:খ-কষ্ট মানুষের অন্তরে ঐশী আলো ও কৃপা প্রত্যক্ষীভূত করে এবং তাঁর আত্মার পরিশুদ্ধতা আনয়ন করে। এ ধরনের পরিশুদ্ধতা দ্বারা পরমসত্তার ধারণা লাভ করা সম্ভব। এ ধারণার যথার্থতা প্রমাণের জন্য 'হাই ইবনে ইয়াকযান' শীর্ষক যে গল্পটির অবতারণা করেন তা সংক্ষেপে এরূপ–ইবনে সিনা একদিন তাঁর কয়েকজন সঙ্গী সাথীর সঙ্গে শহরের উপকণ্ঠে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এ সময় হঠাৎ তিনি এক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পান। বৃদ্ধের নাম হাই ইবনে ইয়াকযান। সিনা তাঁকে তাঁর সঙ্গে সীমাহীন ভ্রমণ পথের সাথী করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বৃদ্ধ তাঁকে বলেন এ ভ্রমণ করা সিনার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ, সিনা তাঁর সঙ্গী সাথীদের ছেড়ে যেতে পারবেন না। এ গল্পে সিনা নিজেকে যৌক্তিক আত্মার (rational soul) প্রতিভূরূপে এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের প্রতীক হিসেবে প্রদর্শন করেন। 'হাই ইবনে ইয়াকযান' সিনার গল্পে অতি মানবীয় আত্মা, যে আত্মা সাধনাবলে সংবেদীয় ও প্রত্যক্ষণশীল জগতের ঊর্ধ্বে আরোহণ করে পরম সত্তার ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

ইবনে তোফায়েল ইবনে সিনার এ শিরোনামটি এবং 'সালমান ওয়া আবযাল' শিরোনামটি গ্রহণ করে দার্শনিক উপন্যাস রচনা করেন। এতে এ ধারণা তুলে ধরেন যে, যৌক্তিক ও অনুমানলব্ধ জ্ঞান এবং স্বজাত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে স্বজাত ও সাক্ষাৎ জ্ঞানের মাধ্যমেই পরমসত্তার সজীব সংস্পর্শ লাভ করা যায়। ইবনে সিনার ধারণালব্ধ উপাখ্যান থেকে পরবর্তীকালে ইবনে তোফায়েলসহ অনেকেই প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্বের ধারণাটি লালন করেন।

অনুশীলনী

ইবনে সিনার অধিবিদ্যার পাঠশেষে সারসত্তা ও অস্তিত্ব, আবশ্যিক ও সম্ভাব্য সত্তা এবং নির্গমন তত্ত্বের ওপর পৃথক পৃথক বিবরণ দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য/মিথ্যা

১। ইবনে সিনার অধিবিদ্যা হল সত্তাকে সত্তা হিসেবে অধ্যয়ন। সত্য/মিথ্যা

২। ইবনে সিনার মতে সত্তা জাতি নয়। সত্য/মিথ্যা

৩। ইবনে সিনার মতে সত্তা চার প্রকার। সত্য/মিথ্যা

৪। ইবনে সিনার মতে সারসত্তা ও অস্তিত্ব একই। সত্য/মিথ্যা

৫। সিনার মতে প্রথম কারণই খোদা। সত্য/মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ইবনে সিনার অধিবিদ্যার মূল উপাদান হল

(ক) সারসত্তা (খ) অস্তিত্ব

(গ) সত্তার ধারণা (ঘ) কোনটিই নয়।

২। ইবনে সিনার মতে প্রত্যেক বস্তুর বিশেষ বাস্তবতা হচ্ছে এর

(ক) অস্তিত্ব (খ) সারসত্তা

(গ) আবশ্যিকতা (ঘ) সম্ভাব্যতা।

৩। ইবনে সিনার মতে খোদা হচ্ছেন

(ক) উপাদান কারণ (খ) নিমিত্ত কারণ

(গ) রূপগত কারণ (ঘ) কোনটিই নয়।

৪। ইবনে সিনা চালক শক্তিকে বলেন

(ক) প্রথম শক্তি (খ) দ্বিতীয় শক্তি

(গ) সর্বশেষ শক্তি (ঘ) কোনটিই নয়।

৫। সিনার মতে জড় হচ্ছে

(ক) অস্থায়ী (খ) চিরস্থায়ী

(গ) চিরন্তন (ঘ) ক্ষণস্থায়ী।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইবনে সিনার মতে অধিবিদ্যা কি? অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু কি?

২। আবশ্যিক সত্তা এবং সম্ভাব্য সত্তার বিবরণ দিন।

৩। ইবনে সিনার সৃষ্টি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর। তাঁর নির্গমন তত্ত্বটি কি সমর্থনযোগ্য।

উত্তরমালা

সত্য/মিথ্যা

১। সত্য ২। সত্য ৩। মিথ্যা ৪। মিথ্যা ৫। সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। গ ২। খ ৩। খ ৪। গ ৫। গ

পাঠ-৪

আত্মা, মন ও জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ে ইবনে সিনার ধারণা

Ibn Sina's concept of Soul, Mind and Knowledge

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- আত্মা সম্পর্কে ইবনে সিনার ধারণা আলোচনা করতে পারবেন।
- মন সম্পর্কে ইবনে সিনার বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইবনে সিনার জ্ঞানতত্ত্বে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ইবনে সিনা তাঁর আত্মা, মন ও জ্ঞানতত্ত্বের ওপর বিখ্যাত গ্রন্থ সিফা, নাজাত এবং ইশারাতে দীর্ঘ আলোচনা করেন। মনের বিভিন্ন রকম শক্তির বিভাগ করে তিনি যেভাবে মনকে ব্যাখ্যা করেন তা অভিনবত্বের দাবি রাখে। আত্মা কি? আত্মা এক না বহু? এই আত্মা কি দেহের সৃষ্টি, না দেহ আত্মার সৃষ্টি? আত্মার সঙ্গে দেহের সম্পর্ক কি এবং এ আত্মা কি অমর? আত্মা সম্পর্কে ইবনে সিনা এসব প্রশ্ন উত্থাপন করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর আত্মা-তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর জ্ঞানতত্ত্বও জড়িত। যদিও প্লেটো, এ্যারিস্টটল ও বিশেষভাবে নব্য-প্লেটোবাদীদের চিন্তাধারা তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তবুও একথা বলা অসমীচীন হবে না যে, ইবনে সিনা তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারারও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। যেমন– তাঁর নিজস্বতার বিকাশ আমরা তাঁর যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার আলোচনায় লক্ষ্য করেছি। এ পাঠে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলোর সরল ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

মন ও আত্মা

আমরা প্রথমে মন সম্পর্কে আলোচনা করব। ইবনে সিনা তাঁর কিতাবুল নাফ্স গ্রন্থে মন সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবিত রীতি অনুযায়ী মনকে বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। মনকে তিনি একক জাতি বলেন এবং দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্কের ব্যাপারে বলেন মন দেহ থেকে আলাদা সত্তা (entity)। এটি দেহের কোন অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। মন একটি ব্যক্তিক দ্রব্য (individual substance)। মনকে তিনি বিশ্লেষকের জন্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করেন। তিনি বলেন প্রথমত মন তিন প্রকার। এর প্রথমটি (ক) উদ্ভিদ মন (vegetable বা নাফসে নুবাকী)। এ মনের তিন প্রকার শক্তি আছে:

(১) প্রথম শক্তিটি হচ্ছে খাদ্য সংগ্রহকারী বা পুষ্টিসাধক শক্তি (nutritive power)। এ nutritive power বা পুষ্টিসাধক শক্তি দেহে অবস্থানকালে অন্য দেহকে পূর্ব আকারে পরিবর্তন করার ক্ষমতা ধারণ করে।

(২) উদ্ভিদ মনের দ্বিতীয় প্রকার শক্তিটি হচ্ছে বর্ধন শক্তি। এ শক্তি পূর্ণতা (perfection) প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিজের আকার ঠিক রেখে ক্রমাগত নিজেকে বৃদ্ধি করতে থাকে।

(৩) উদ্ভিদ মনের তৃতীয় শক্তিটি হচ্ছে প্রজনন শক্তি। এ প্রজনন শক্তি দেহ থেকে নিজের অনুরূপ কিছু শক্তি সংগ্রহ করে বাস্তবে এর অনুরূপ অন্যদেহ সৃষ্টি বা উৎপাদন করতে পারে।

(খ) জীব-মন (animal mind) দুটি শক্তির সমন্বয়ে গঠিত। এর একটি (১) প্রেষণামূলক শক্তি ও অন্যটি (২) প্রত্যক্ষণমূলক শক্তি। প্রেষণামূলক শক্তি দু'ভাগে বিভক্ত। এর একটি হচ্ছে ক্ষুণ্নিবৃত্তির শক্তি

এবং অন্যটি ক্রিয়াশক্তি। ক্ষুণ্নিবৃত্তি আকর্ষণীয় বা বিকর্ষী হতে পারে। ক্ষুণ্নিবৃত্তি আকর্ষণীয় হলে এর প্রকাশ হয় কামনা দ্বারা; আর বিকর্ষী হলে এর প্রকাশ ঘটে রুক্ষ মেজাজের মাধ্যমে। কর্মশক্তি বা কুয়াতুল ফায়েলাহ দৈহিক গতি বা স্নায়ুমন্ডলী এবং মাংসপেশীর ওপর ক্রিয়াশীল এবং প্রসারণ ও সংকোচনের কারণ হিসেবে কাজ করে।

জীব-মনের প্রত্যক্ষণমূলক শক্তি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ (external and internal) হয়। বাহ্যিক শক্তির মধ্যে দর্শন, শ্রুতি, ঘ্রাণ, স্বাদ এবং স্পর্শ অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। অভ্যন্তরীণ শক্তির আরম্ভ হয় সাধারণ জ্ঞান দ্বারা। উচ্চ বৃত্তির সাহায্যে বিশ্লেষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যক্ষণগুলো এখানে একত্রিত হয়। মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে সাধারণ জ্ঞান অবস্থান করে। যে শক্তি প্রত্যক্ষণের ওপর প্রথম ক্রিয়া করে তা হয় গঠনমূলক না হয় কল্পনাশক্তি। এরা মস্তিষ্কের মধ্যভাগে অবস্থিত। কল্পনাশক্তি ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষণকে দেশ-কাল ও পরিমাণের অবস্থা থেকে মুক্ত করে মনকে বস্তুর প্রতিরূপ গঠনে সাহায্য করে। এর ফলে ইন্দ্রিয়ের ওপর এ অবস্থায় আর কোন প্রভাব পড়ে না।

গঠনমূলক শক্তির পর আসে চিন্তামূলক শক্তি। এ শক্তির কাজ হচ্ছে প্রত্যক্ষণ ও প্রতিরূপ থেকে সাধারণ উপাদানসমূহকে বিমূর্ত করা এবং এদের থেকে ধারণা গঠন করা। মূল্যায়নিক শক্তি এসব ধারণাকে দলবদ্ধ করে অবধারণ গঠন করে। ইবনে সিনা এ জাতের অবধারণকে সহজাত শক্তি বলে চিহ্নিত করেন। মূল্যায়নিক শক্তি জীবের প্রত্যক্ষণ শক্তি বা বৌদ্ধিক শক্তি গঠন করে। ফলে জীব তাদের আপদ বিপদ সম্পর্কে অবহিত হয় এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়। অর্থাৎ বিপদ থেকে বাঁচার জন্য পলায়ন করে বা রুখে দাঁড়ায়। জীব মনের স্মৃতিশক্তি আছে এবং সিনার মতে তা মস্তিষ্কের পশ্চাদভাগে অবস্থিত।

(গ) মানব মন–মানব মন প্রাথমিক অনুভূতিসমূহকে বুদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন গুণ অর্জন করে। এ গুণগুলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ হতে পারে। বাহ্যিক গুণাবলীর প্রথমটি হল মন দৃষ্টি বা ফ্যান্টাসি। এ মন:দৃষ্টি সমস্ত দৃষ্ট-অদৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এগুলো পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায়। এর পরবর্তী গুণগুলো হল রূপায়ণ শক্তি (কুয়াতুল মাসুরাত), কল্পনা শক্তি (কুওয়াতুল মাখিলাত) বা চিন্তাশক্তি (কুওয়াতুল ফাকরাত), ধারণা শক্তি ও স্মরণ শক্তি (কুওয়াতুল জাকেরাত)। ইবনে সিনার মতে এগুলো মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। নাফস আল-নাতেকাতের সঙ্গে এ শক্তির দুটি রূপ প্রকাশ পায়:

(১) জ্ঞানশক্তি বা প্রজ্ঞাশক্তি (কুওয়াতুল আলেমাত) বা চিন্তাশক্তি এবং (২) ব্যবহারিক শক্তি (কুওয়াতুল আমেলাত)। অবিমিশ্র জ্ঞান তথা ব্যবহারিক জ্ঞান পদার্থ থেকে পদার্থোত্তর স্তরের দিকে অর্থাৎ উর্ধ্ব জগতের দিকে গতিশীল হয়; আর প্রজ্ঞাশক্তি বা কুওয়াতুল আলেমাত নিম্নতর জগতের দিকে অগ্রসর হয়। এরূপ জ্ঞান সম্পর্কে ইবনে সিনা বৈয়াকরণ ইয়্যাইয়ার ধারণাসমূহের আরো বিশদরূপ ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি ইয়্যাইয়ার মতবাদ আল-কিন্দি ও আল-ফারাবীর মাধ্যমে লাভ করেন। ইবনে সিনা বলেন মানুষের অমূর্ত জ্ঞান যখন নিম্নতর জগৎ থেকে উচ্চতর জগতের দিকে উন্নীত হয়, তখন এ জ্ঞান চারটি পর্যায়ে বিভক্ত হয়– (১) জড় বা বস্তুজ্ঞান (আকল হায়উলানী) যা সর্বতোভাবে একটি জড়শক্তিরূপে বিদ্যমান, তার সম্ভাবনাসমূহ স্পষ্ট নয়। (২) আকল বিলফায়াল-এর সম্ভাবনাসমূহ পরিষ্কারভাবে আত্মপ্রকাশ করে। (৩) আল আকল বিল মালাকুত-এর চরমসীমা পর্যন্ত পৌঁছায় এবং (৪) আল-আকাল আল-মুস্তাফাদ বা এর আকর্ষণ শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণাসমূহের প্রতি ও পরিশেষে এটি চরম সৃজনীয় জ্ঞান (world spirit)-এর সঙ্গে মিলিত হয়। ইবনে সিনার মনের ধারণা সম্পর্কে নিচে একটি চিত্র দেওয়া হল:

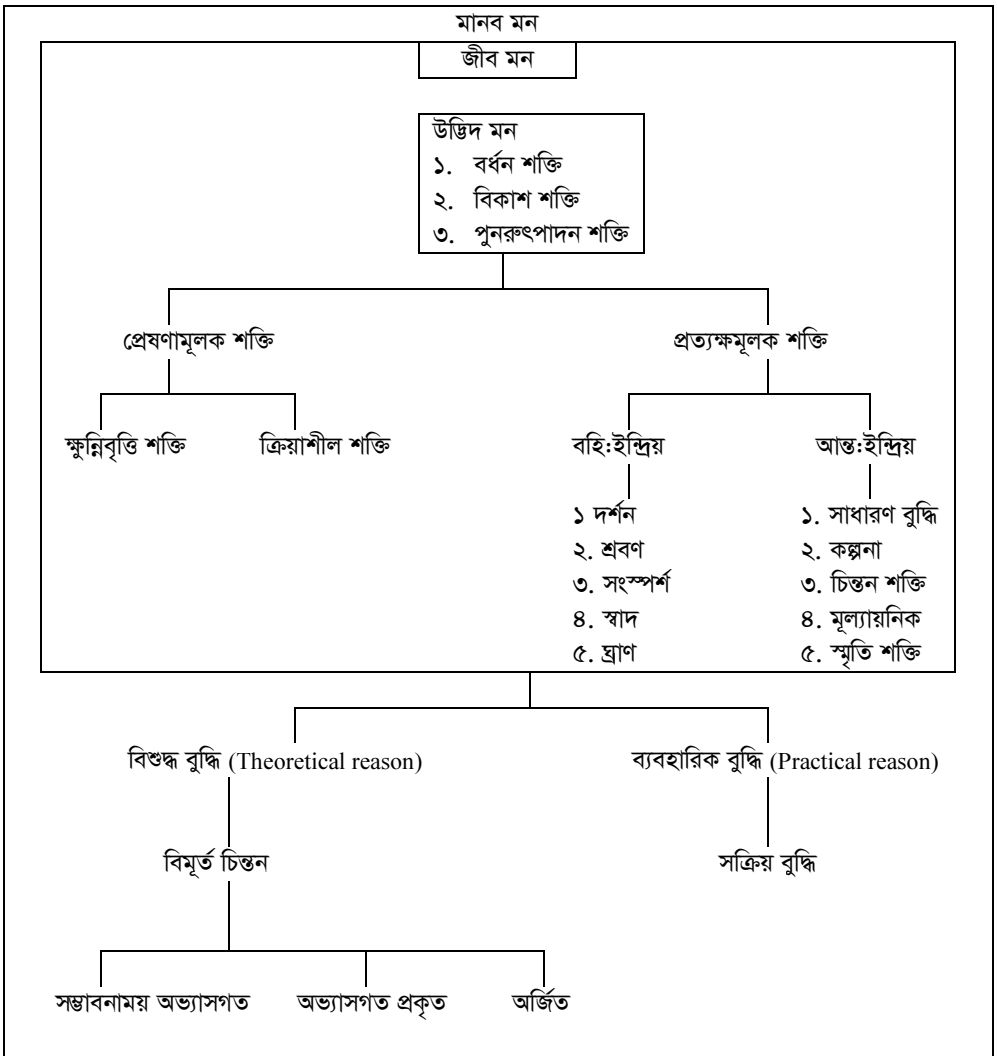

ইবনে সিনার উপরোক্ত বর্ণনা ও চিত্র থেকে আমরা তাঁর মন সম্পর্কীয় ধারণা পাই। কিন্তু তাঁর মতে মনই কি রুহ বা soul? এর প্রশ্নের উত্তর আত্মা সম্পর্কীয় তত্ত্বের আলোচনায় পাওয়া যাবে।

রুহ বা আত্মা সম্পর্কীয় আলোচনা

আত্মা বা 'রুহ' সম্পর্কে ইবনে সিনা কিতাবুন নাফস এবং ইশারাত গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব থেকে তত্ত্বগত (theoretical) মনস্তত্ত্বের আলোচনার সূত্র ধরে আত্মার গতিধারাকে সুফীতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। ইবনে সিনা বলেন আত্মা জড়বস্তু নয়; বরং সুরত বা আকারেরই এক প্রকারভেদ। আত্মার প্রথম পরিপূর্ণতাই দেহের পরিপূর্ণতা। তিনি বলেন এই অবস্থায় 'আত্মা কি'? এ প্রশ্নের পরিবর্তে আত্মা কি করে? এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করাই শ্রেয়। তাঁর মতে আত্মা 'একটি বিমূর্ত বস্তু' (জাওহার মা'নাভী)। বিমূর্ত আত্মাকে প্রমাণ করার জন্য তিনি কতকগুলো প্রমাণ উপস্থাপন করেন– (১) যেসব প্রাচীন মতবাদে আত্মাকে 'সাকার' বলে অভিহিত করা হয়েছে সেগুলোকে ভুল বলে প্রমাণ করা; (২) আত্মার অশরীরী বা আকারবিহীন হওয়ার পক্ষে অবরোহী (apriori) প্রমাণসমূহ পেশ করা। তিনি বলেন, আত্মা যদি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ

করতে পারে বা দেহের অস্তিত্বের পূর্বেও স্বীয় অস্তিত্বের সত্যতার ঘোষণা করতে পারে– তবে স্বীকার করতে হবে যে, আত্মা একটি বিমূর্ত বস্তু।

ইবনে সিনার মতে রুহ বা আত্মা থেকেই শরীরের গঠন ও পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। আত্মা থেকেই শরীরের অস্তিত্ব এবং এর সাহায্যেই দেহের কর্মশক্তি স্থিত হয়। তিনি বলেন আমরা যখন আত্মাকে বিমূর্ত বস্তু বলি তখন প্রশ্ন ওঠে- আত্মা কি তবে জড় আকৃতি বিশিষ্ট আদি বুদ্ধি? (আকল-মাদী), না বস্তুভিত্তিক চেতনা? আত্মা কি বোধগম্য অবয়ব অনুধাবন করতে সক্ষম, নাকি আত্মা কোন মাধ্যম ছাড়াই নিজেকে অনুধাবন করতে বা জানতে সক্ষম? আত্মার এমন কত গুলো অদৃশ্য (মালাকুত) শক্তি আছে যেগুলো বুদ্ধি ছাড়া পরস্পরকে জানার ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অনুভূতির পক্ষে নিজেকে অনুভব করা সম্ভব নয়। কিন্তু বুদ্ধি বা আকল নিজেকে নিজেই বুঝে। ইবনে সিনা এখানে বলেন যে, আত্মা আসলে একটি জ্ঞানময় সত্তা যা জড় থেকে পৃথক এবং এর কোন জড় আকৃতি নেই।

এখানে একটি প্রশ্ন উদয় হয় এভাবে আত্মার যদি জড় আকৃতি না থাকে এবং এটি যদি একটি স্বতন্ত্র সত্তা হয় তবে আত্মার জন্য দেহের প্রয়োজন হল কেন? ইবনে সিনা বলেন আত্মার জন্য দেহের প্রয়োজন এ কারণে যে, দেহের অস্তিত্বের পূর্বে এর কোন স্বতন্ত্র সত্তা না থাকায়, দেহের সৃষ্টির পর আত্মা এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। কিন্তু আত্মা ও দেহের মধ্যে যদি কোন যোগসূত্র থাকে এবং দেহের পূর্বে এর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না বলে ধরে নেই– তাহলে মৃত্যুর পর এর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের কি প্রমাণ দেওয়া যায়? ইবনে সিনা বলেন যে, আত্মা পূর্বাপর বা বর্তমান কোন অবস্থাতেই দেহের অধীন নয়। উপরন্তু এটি একটি অবিমিশ্র সত্তা (entity) যাকে তিনি জাওহার বাশিত বলেন।

ইবনে সিনা আত্মার ধারণাকে আকৃতির ধারণা থেকে পৃথক করেছেন। তিনি আত্মার ধারণা সম্পর্কে বলেন যে, প্রথমত আত্মা একক (Unity, not multiple) যার জন্য সমস্ত অনুভূতি সংক্রান্ত অবস্থার পরিপূর্ণতা সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়ত আত্মার মূল সত্তার বিবেচনায় সাকারের আকৃতির পরিবর্তন সত্ত্বেও এর অস্তিত্ব স্বীয় বৈশিষ্ট্যে অটল থাকে।

এরপর আত্মা সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর না দিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রশ্নটি হল আত্মা কি মরণশীল না অমর? ইবনে সিনা এ সম্পর্কে বলেন যে, আত্মা দেহের মৃত্যুর সাথে মরে যায় না। কারণ আত্মা সর্বতোভাবে দূষণমুক্ত। দেহ দূষণযুক্ত হতে পারে কিন্তু আত্মা মূলতঃ অজড়ীয় বলে দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও দূষিত হয় না (not corrupted)। যা পচনশীল বা দূষিত নয় তা ধ্বংসশীল নয়। বিধায় আত্মা দেহের মৃত্যুর পর ধ্বংস হয় না। উপরন্তু দেহ আত্মার নিমিত্ত কারণ বা পরিণতি কারণ নয় বলে এসব কারণের কারণ ধ্বংস হলেও আত্মা অবিকল থাকে।

ইবনে সিনার মতে আত্মার অমরত্বের দ্বিতীয় কারণ হল আত্মা দেহে থেকে আসে না বা জন্ম নেয় না বা এটি দেহের কোন শক্তিও (faculty) নয়। আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক দ্রব্য (different substance)। তা যদি হয়, তবে আত্মার সত্তা অন্য কিছু থেকে আসে দেহ থেকে নয়। আবার আত্মা অবিচ্ছেদ্যভাবে দেহের সঙ্গেও যুক্ত নয় এবং দেহ এর কারণও নয়। তাই যদি হয় তবে বলা যাবে না যে, দেহের অস্তিত্ব আত্মার অস্তিত্বের পূর্বে এবং এদের মধ্যে কারণগত পূর্বাপর সম্পর্ক আছে। সুতরাং দেহের মৃত্যুর সাথে আত্মার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

ইবনে সিনা আরও বলেন যে, আত্মা সম্পূর্ণরূপে সরল (simple) এবং যৌগিক নয় (not composite) বলে আত্মা কখনও জড় ও আকারে বিভক্ত নয়। আত্মার মধ্যে জড় বা আকারের মাধ্যমে বস্তুকে ধ্বংসকারী কারণ হিসেবে কোন দূষণ (corruption) প্রবিষ্ট হয় না বলে এর মধ্যে অনড় অবস্থানের ধারণা (concept of persistence) বিদ্যমান। এ ধারণা থেকেই তিনি বলেন আত্মা অমর।

ইবনে সিনা তাঁর মরমীবাদের ধারণায় আত্মা সম্পর্কে বলেন যে, আত্মা সর্বশেষে চালক শক্তির (Active intelligence) সঙ্গে পুন:যুক্ত হয় অর্থাৎ এর পূর্বতন স্থানে ফিরে আসে।

ইবনে সিনার জ্ঞানতত্ত্ব

ইবনে সিনার মতে সকল প্রকার জ্ঞান এক ধরনের বিমূর্তন। এ বিমূর্তন কোন জ্ঞাত বস্তুর আকারের ব্যাপারে প্রযোজ্য। তিনি এখানে বিভিন্ন মাত্রার বিমূর্তন শক্তির ওপর জোর দেন। তাঁর মতে এ বিমূর্তন শক্তির প্রকাশ হচ্ছে জ্ঞান সম্পর্কীয় বৃত্তির মধ্যে। এ কারণে জ্ঞানজাত কর্মের জন্য সংবেদীয় প্রত্যক্ষণের প্রয়োজন উপাদানের (matter) উপস্থিতি। কল্পনা বাস্তব উপাদানের উপস্থিতি থেকে মুক্ত; কিন্তু উপাদানগত সংস্পর্শ ছাড়া কল্পনা জ্ঞানীয় পর্যায়ে আসে না। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিতে বিশুদ্ধ আকার সর্বজনীনভাবে জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। ইবনে সিনা 'বিমূর্তনের পর্যায় তত্ত্ব' বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। কারণ তিনি খুব সম্ভবত এ্যারিস্টটলের এ জাতীয় তত্ত্বের প্রতি উত্থাপিত আপত্তিসমূহ পরিহার করতে চেয়েছেন। এখানে তাঁর সামনে যে প্রশ্নটি আসে তা হল– প্রত্যক্ষণ যদি কেবলমাত্র আকারের জ্ঞান হয়, তবে আমরা কিভাবে জানতে পারব যে, আকার জড়ের মধ্যে অস্তিত্বশীল? অথবা আমরা কেমন করে জানব যে জড় আদৌ অস্তিত্বশীল কিনা?

প্রত্যক্ষণের ব্যাপারে ইবনে সিনার অবস্থান সাধারণত সরল বাস্তববাদের মত। তিনি প্রত্যক্ষণজাত গুণাবলীর আপেক্ষিক মতবাদ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ এমন বস্তুর কথা বলেন যাদের নিজস্ব কিছু বাস্তব গুণ আছে। বস্তুগুলো এরূপ মনে হয়, এরূপ-এরূপ পরিস্থিতিতে এবং এরূপ-এরূপ অবস্থানে (appear as such and such under such and such circumstances and from such and such position)। এর জন্য ইবনে সিনার কিছু আত্মগত বক্তব্যই দায়ী। তিনি 'মুখ্য' এবং 'গৌণ' প্রত্যক্ষণের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁর মতে মুখ্য প্রত্যক্ষণ আত্মগত (subjective) বা প্রত্যক্ষণকারীর মনের অবস্থা এবং 'গৌণ' প্রত্যক্ষণ হচ্ছে বহির্জগতের বিষয়। ইবনে সিনার এ ধরনের ধারণার প্রতিফলন ঘটে মধ্যযুগীয় দর্শনে এবং অনেক পরে লকের মুখ্য ও গৌণ গুণের ধারণার মধ্যে।

কিন্তু ইবনে সিনার প্রত্যক্ষণ-তত্ত্বের মূল চাবিকাঠি প্রত্যক্ষণের অভ্যন্তরীণ (internal) এবং বাহ্যিক (external) রূপে পার্থক্য করণের মধ্যে নিহিত। তিনি প্রত্যক্ষণকে অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষণ এবং বাহ্যিক প্রত্যক্ষণ হিসেবে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁর মতে, বাহ্যিক প্রত্যক্ষণ হচ্ছে বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ। অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষণকে তিনি পাঁচটি বৃত্তিতে ভাগ করেন। এসব করার পেছনে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হল গুণের ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যকলাপ বা ক্রিয়া পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা।

ইবনে সিনার মতে পাঁচ প্রকার অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষণের মধ্যে (১) প্রথমটি সেনসাস কম্যুনিস যা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র। এটি সংবেদোপাত্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষণকে সংযুক্ত করে এবং এটি অবশ্যই অভ্যন্তরীণ, কারণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনটি এ কাজ করতে পারে না (২) দ্বিতীয় অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষণ হল কল্পনাবৃত্তি যা প্রত্যক্ষণজাত ভাবমূর্তিকে ধারণ করে (৩) তৃতীয় অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষণ হল আবার কল্পনা যা ঐ ভাবমূর্তির ওপর ক্রিয়াশীল হয় একত্রীকরণ ও বিচ্ছিন্নকরণের মাধ্যমে। মানুষের মধ্যে এ বৃত্তি যুক্তি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয় যাতে মানবীয় কল্পনা চিন্তা করতে পারে এবং ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তিতে পরিণত হয়। চতুর্থ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষণ হল ওয়াহাম (wahm), পাশ্চাত্যে যা ভিস এসটিমাটিভা হিসেবে পরিচিত। এটি জড়ীয় বস্তুর মধ্যে প্রেম এবং ঘৃণা, উপকারিতা এবং অপকারিতার মত অ-জড়ীয় গতিসমূহকে প্রত্যক্ষণ করে এবং যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হোক বা না হোক এটি আমাদের চরিত্রের মূল ভিত্তি। (৫) পঞ্চম অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষণ হচ্ছে স্মৃতিতে ঐসব ধারণা যাদেরকে তিনি "অভিপ্রায়" (intention) বলে অভিহিত করেন।

ইবনে সিনার মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষায় ওয়াহামতত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে আদি উপাদান। এটি আধুনিক যুগের মনস্তত্ত্ববিদ্যার "স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া" তত্ত্বের মত। এ্যারিস্টটলের মতে কল্পনা বা স্বয়ং প্রত্যক্ষণের দ্বারা এ কাজ সমাধা করা হয়। কিন্তু ইবনে সিনা বলেন প্রত্যক্ষণ ও কল্পনা আমাদেরকে কেবলমাত্র কোন বস্তুর প্রত্যক্ষণজাত (perceptual) গুণের কথা বলে। এগুলো হল রং, আকার, সাইজ ইত্যাদি। কিন্তু

এগুলো বস্তুর চরিত্র বা "অর্থ" সম্পর্কে আমাদেরকে কিছুই বলে না। অথচ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভ্যন্তরীণ বৃত্তি দ্বারা এগুলো বিকশিত হওয়া আবশ্যক। এজন্য ওয়াহাম তত্ত্বের নৈতিক তাৎপর্য ছাড়াও আরও দিক আছে। এটি মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ যা পরিবেশের প্রতি আমাদের সহজাত ও আবেগপ্রসূত প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে।

ইবনে সিনা বলেন, "স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া" (nervous response) বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এটি বিশুদ্ধভাবে সহজাত– যেমন প্রথমেই ভেড়া বাঘ দেখলে পলায়ন করে বা মাতা শিশুর জন্য ভালবাসা বোধ করে। এগুলো কোন পূর্বতন অভিজ্ঞতা ছাড়াই ঘটে এবং এগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনের মধ্যে নিহিত কোন এক প্রকার "প্রাকৃতিক প্রেরণার" মাধ্যমেই ঘটে। দ্বিতীয়তঃস্নায়বিক প্রতিক্রিয়া দৃশ্যত অভিজ্ঞতাপ্রসূত পর্যায়ে কাজ করে (operates upon quasi-empirical level)। অতীতে একটি কুকুর লাঠি অথবা পাথরের ঘায়ে আক্রান্ত হয়ে ব্যথা অনুভব করে। এ ধরনের আনুষঙ্গিক বস্তু ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে বস্তুর ভাবমূর্তির সংযোগ সাধন করে সে পলায়ন করে। এ ধরনের প্রত্যক্ষ সংযোগের ঘটনা অপ্রত্যক্ষ এবং অযৌক্তিকও হতে পারে। এ ধরনের ঘটনা সাধারণত প্রাণী এবং স্বল্পবুদ্ধির লোকের মধ্যে ঘটে থাকে। প্রায় একই রকমের সংযোগ নীতি বা 'অসহিষ্ণু নীতি' আধুনিক যুগের ব্যবহারিক মনোবিদ্যায় 'সাপেক্ষীকরণ' (conditioned reflex) নীতি হিসেবে বহুল প্রচলিত। সে যাহোক, এটা পরিষ্কার যে ইবনে সিনা তাঁর ওয়াহামতত্ত্বে বলতে চান যে, ওয়াহাম ধারণার অনুসঙ্গের ভিত্তিতে যে প্রত্যক্ষণজাত ভবিষ্যৎবাণী করে তার অসংখ্য কারণ আছে এবং এর প্রত্যক্ষণজাত অবধারণ অবৈধ বা মিথ্যাও হতে পারে। এ্যারিস্টটল প্রত্যক্ষণের এ ধরনের ব্যাখ্যা করতে পারেননি। কারণ তিনি অতীত অভিজ্ঞতার ওপর উপস্থিত প্রত্যক্ষণজাত অবধারণের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু ইবনে সিনার মধ্যে এ ধরনের উপলব্ধি স্পষ্ট। এ তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি জ্ঞানের প্রত্যক্ষণ পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছেন।

ইবনে সিনার বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত মতবাদ উপরোক্ত আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি জ্ঞানের প্রকৃত স্তরে পৌঁছেন। এ মতবাদ অবশ্য একান্তভাবে তার নিজস্ব নয়– কারণ তাঁর পূর্বে এ্যারিস্টটল সংক্ষেপে, অ্যাফ্রোডিসিয়াসের আলেকজান্ডার এবং আল-ফারাবী বিস্তারিতভাবে এ মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। ইবনে সিনা তাঁদের মতবাদের সঙ্গে নতুন কিছু তত্ত্ব সংযোগ করেন এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে তাঁর তত্ত্ব দেন। এ মতবাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এর প্রথমটি হচ্ছে মানুষের অভ্যন্তরীণ সুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি এবং মানুষের বাহ্যিক সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি। দ্বিতীয়টির প্রভাব এবং পরিচালনায় প্রথমটি উন্নীত ও পরিপক্ক হয়।

ইবনে সিনা বলেন যে, মানুষের অভ্যন্তরীণ সুপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি অবিভাজ্য, অজড়ীয় এবং অধ্বংসশীল। এ মতের ধর্মীয় গুরুত্ব আছে। আল-ফারাবীর মতে কেবলমাত্র উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি বেঁচে থাকে এবং বাকী সব দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যায়। ইবনে সিনা বলেন ঠিক তা নয় বরং সমস্ত মানুষের আত্মা অমর। বুদ্ধিবৃত্তির অমরতার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন যে ধারণা বা "আকার" অবিভাজ্য হওয়ায় কোন একটি অঙ্গে এটিকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। আর যদি তা করা না যায় তবে দৈহিক সমাপ্তির সঙ্গে এর সমাপ্তি ঘটে না।

ফারাবী বলেন, বিশেষের সংবেদীয় অভিজ্ঞতা থেকে 'সর্বজনীন' এর বিমূর্তকরণ করা হয়। কিন্তু ইবনে সিনা বলেন, 'সর্বজনীন' সংবেদনের ভাবমূর্তি থেকে বের হতে পারে না, কারণ এটি সেখানে অবস্থান করে না। উপরন্তু, সারসত্তা বাস্তবিকভাবে 'সর্বজনীন' নয়। এটি কেবল এভাবে আমাদের মনে আচরণ করে মাত্র। সুতরাং ইবনে সিনা মনে করেন আমাদের মনের কাজ হচ্ছে 'বিবেচনা করা' এবং সংবেদীয় অভিজ্ঞতার বিশেষের ওপর চিন্তা করা। এই কার্যক্রম 'প্রত্যক্ষ স্বজ্ঞার' (act of intuition) কর্মের সাহায্যে সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি থেকে সারসত্তাকে গ্রহণের জন্য মনকে প্রস্তুত করে। সর্বজনীন আকারের প্রত্যক্ষণ তখন বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মার গতি হয়ে যায়। এর ফলে বিশেষকে একক বা সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা আমাদেরকে এ ধারণায় উপনীত করে। যদি ব্যক্তিক উদাহরণের প্রত্যক্ষণ এবং এদের সমতুল্যের উল্লেখ বিশ্বজনীন (Universal)-এর উৎপাদনের যথেষ্ট কারণ হত, তাহলে জ্ঞান অর্জন যান্ত্রিক হয়ে যেত এবং এই যান্ত্রিকতা আবশ্যিকভাবে কার্যকর হতে থাকত।

এটি অবশ্য বাস্তবে সত্য নয় যে, জ্ঞাতকে (cognition) যান্ত্রিকভাবে এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদন করা যায়। ইবনে সিনার মতে জ্ঞানের উৎপত্তি রহস্যজনক এবং এ জ্ঞান প্রতিটি স্তরে সত্তাকে জড়িত করে। বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের মধ্যে এটি মোটামুটি সত্য নয় যে, "আমি জানি" (I know it); বরং এটি সত্য যে, "এটা আমার মধ্যে ঘটে" (It occurs to me)। ইবনে সিনার মতে জ্ঞান অন্বেষণকারী সকলের মধ্যেই এ ধরনের প্রার্থনাসূচক গুণ আছে। এর জন্য মানুষের প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এ প্রচেষ্টার ফল প্রদান হল আল্লাহর কাজ বা সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তির কাজ। ইবনে সিনা এখানে ইলহাম (Intuition) বা স্বজ্ঞার সাহায্যে জ্ঞান উৎপত্তির কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং প্রত্যক্ষণ জাতীয় সবকিছুর অনেক উর্ধ্বে জ্ঞানের স্থান চিহ্নিত করেছেন। ইবনে সিনার মতে প্রচেষ্টালব্ধ স্বজ্ঞার ফলে মানুষ বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি (insight) লাভ করে। এই অন্তর্দৃষ্টিই বিস্তারিত এবং স্পষ্ট জ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা।

অনুশীলনী

মন এবং আত্মা সম্পর্কে ইবনে সিনার অভিমত চিন্তা করে বের করুন এবং লিখুন। তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য/মিথ্যা

১। ইবনে সিনার মতে মন ছয় প্রকার। সত্য/মিথ্যা
২। উদ্ভিদ মনের কেবল বর্ধনশক্তি আছে। সত্য/মিথ্যা
৩। ইবনে সিনার মতে আত্মা জড়বস্তু নয়। সত্য/মিথ্যা
৪। ইবনে সিনার মতে আত্মা থেকে শরীরের গঠন হয়। সত্য/মিথ্যা
৫। ইবনে সিনার মতে প্রত্যক্ষণই জ্ঞান। সত্য/মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। উদ্ভিদ মনের দ্বিতীয় প্রকার শক্তি হচ্ছে
(ক) উৎপাদন শক্তি (খ) বর্ধনশক্তি
(গ) প্রজনন শক্তি (ঘ) কোনটিই নয়।

২। ইবনে সিনার মতে আত্মা
(ক) মরণশীল (খ) অমর
(গ) জড়ীয় (ঘ) কোনটিই নয়।

৩। ইবনে সিনার মতে আত্মা দূষণ
(ক) মুক্ত (খ) যুক্ত
(গ) মূলক (ঘ) নিরপেক্ষ।

৪। ইবনে সিনার মতে প্রত্যক্ষণ
(ক) তিন প্রকার (খ) সাত প্রকার
(গ) পাঁচ প্রকার (ঘ) কোন প্রকারই নয়।

৫। ইবনে সিনার মতে জ্ঞান
(ক) প্রত্যক্ষণমূলক (খ) সংবেদনমূলক
(গ) স্বজ্ঞামূলক (ঘ) কোনটিই নয়।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মন সম্পর্কে ইবনে সিনার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২। ইবনে সিনার মতে আত্মা কি? তাঁর মতে আত্মা কি আছে?
৩। জ্ঞান সম্পর্কে ইবনে সিনার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন এবং চিন্তা করে আপনার মন্তব্য লিখুন।

উত্তারমালা

সত্য/মিথ্যা

১। মিথ্যা	২। মিথ্যা	৩। সত্য	৪। সত্য	৫। মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। খ	২। খ	৩। ক	৪। গ	৫। গ